এষা

গীতিকাব্য

অক্ষয়কুমার বড়াল
প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

মূল্য কাগজে বাঁধাই ৸০

" রেশমী বাঁধাই ১৶০

This edition has been brought out

BY

DR. NARENDRA NATH LAW M.A., B.L., PH.D

PREMCHAND ROYCHAND SCHOLAR

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এষা—ইষ্ ধাতু নিষ্পন্ন; বৈদিক অর্থ—অন্বেষণীয়া, প্রার্থনীয়া, বাঞ্ছনীয়

সূচী

পরিচয় ৵০

৺কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল ও তাঁহার কাব্য-প্রতিভা ১৷৵০

উপহার ৩

নিবেদন ৭

মৃত্যু ৯—৩২

১। "বাবা, মা—কেন এত" ১১

২। পত্রবাহী ডাকে ১৩

৩। এই কি মরণ ১৫

৪। মরণে কি মরে প্রেম ১৯

৫। ডুবিয়া—ডুবিয়া জলে ২২

৬। গৃহতলে আছে বসি' ২৪

৭। এই কি জীবন ২৬

অশৌচ ৩৩—৭৪

১। এই কি প্রভাত ৩৫

২। মৃত্যু! প্রতিদিবস ঘটনা ৩৮

৩। গৃহ নিরানন্দ অন্ধকার ৪১

৪। হে বিগ্রহ ৪৪

৫। হে পূত তুলসী ৪৮

৬। দ্বিপ্রহর ; বর্ষানিশা
৭। একবার চীৎকারি'—চীৎকারি'
৮। নাই যদি—নাই লোকান্তর
৯। কেন শোকে মূঢ়ের মতন
১০। নিশ্চয় আছেন এক জন
১১। সদ্যঃস্নাত জ্যেষ্ঠপুত্র
১২। দাও শান্তিজল

শোক

১। উঠিছে ডুবিছে তারাগণ
২। হে প্রিয়, ভাবিয়াছিলে
৩। দুস্তর প্রান্তর
৪। জীবনে চাহি না কিছু আর
৫। নাহি সে উৎসাহ, আশা
৬। অজয়ে জিজ্ঞাসে দাসী
৭। গেছে নিশা
৮। আবার দুঃস্বপ্ন সেই
৯। আসে সন্ধ্যা
১০। প্রভাত প্রশান্ত স্থির
১১। সুপ্ত গ্রাম
১২। অপগত মেঘ-আবরণ
১৩। শোকাচ্ছন্ন, পুরীপ্রান্তে
১৪। যায়, দিন যায়

১৫। ওই বহ্নি—ওই ধূম ১১৬
১৬। শিশু আজ সন্ধ্যাবেলা ১১৭
১৭। এখনো কাঁপিছে তরু ১১৯
১৮। গোলাপের দলে দলে ১২১
১৯। তরল আলোকে গেছে ১২২
২০। প্রকৃতি—জননী—জননী ১২৫
২১। আবার এসেছি আমি ১২৯

না ১৩৩—১৫৯

১। সে সময়ে দিও দেখা ১৩৫
২। সতী, মরণে ভাবি না আর ১৩৭
৩। হে মরণ, ধন্য তুমি ১৪০
৪। গৃহচূড়ে নর যথা ১৪২
৫। আর কেন বাঁধি তোরে ১৪৪
৬। ধর মোর কর ১৪৬
৭। কি স্বপন সুমধুর ১৪৮
৮। হা প্রিয়া—শ্মশান-দগ্ধা ১৫৫

পরিচয়

অক্ষয়কুমার বাঙ্গালার এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। তাঁহার নাম বহুদিনই জানিতাম; কিন্তু এষা পড়িবার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। তাঁহার অন্য কোন গ্রন্থও ইতিপূর্ব্বে আদ্যোপান্ত পড়ি নাই। সাময়িক পত্রে কথন কথন তাঁহার দু'একটী কবিতা পড়িয়া থাকিতে পারি; কিন্তু সে সকলে তাঁহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন বিশেষ সংস্কার জন্মে নাই। সুতরাং সর্ব্বসংস্কারশূন্য হইয়াই বইখানি পড়িতে বসি। পড়িতে আরম্ভ করিয়া আর ছাড়িতে পারিলাম না; প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একাধিকবার পড়িলাম; বন্ধুবান্ধবদিগকে অনেকবার ইহার বাছা বাছা কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইলাম। সকলেই এই কবিতাগুলির মৌলিকতা, বস্তুতন্ত্রতা ও সর্ব্বোপরি ইহার কুত্রাপি কোনপ্রকার কষ্টকল্পনার বা নাটুকে ছলাকলার গন্ধমাত্র নাই দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। আমার মনে হয়, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে অক্ষয়কুমার এই শোকাত্মক গীতিকাব্যে এক অপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে এই এষাখানি বিশ্বসাহিত্যেও অতি উচ্চ স্থান পাইতে পারে; ইহাতে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি আছে বলিয়া মনে করি না।

কাব্যের লক্ষণ

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়াছেন। রসাত্মকতা কাব্যের একটী অপরিহার্য্য লক্ষণ। যে বাক্যে কোন না কোন রস উথলিয়া উঠে, তাহা যে আদৌ কাব্য নহে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যাহা মিষ্ট লাগে, অর্থাৎ যে বাক্যের আস্বাদ আছে, সচরাচর লোকে তাহাকেই রসাত্মক বলিয়া মনে করে।

কিন্তু রস বলিলে, কেবল মিষ্টত্ব বুঝায় না; হাস্যাদ্ভুতকরুণরুদ্রাদিকে এখানে রস বলা হইয়াছে। এ সকল রস যে বাক্যে ফুটে না, তাহা রসাত্মক নহে, তাহা কাব্য হইতেই পারে না। যে বাক্য কেবল ঝঙ্কারই তুলে, কাণেই মধু ঢালিয়া দেয়, এবং আপনার স্বরলালিত্যের দ্বারা চিত্তকে নাচাইয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা বাক্যহীন সঙ্গীতের তানলয়ের মত বিবিধ ভাবের দ্যোতক হইলেও, প্রকৃত কাব্য নহে। কাব্য কেবল ধ্বনি নহে, কাব্য বাক্য। বাক্য—অর্থযুক্ত শব্দ। সুতরাং কাব্যের রস কেবল ঝঙ্কারে ফুটিলেই চলে না, সার্থক শব্দেও তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। যে বাক্য আপনার অর্থের দ্বারা হাস্যাদ্ভুতকরুণরুদ্রাদি রস ফুটাইয়া তুলে, তাহাই কাব্য। কিন্তু কাব্যালোচনার ইহাই শেষ কথা নহে। কেবল রসবিশেষের উদ্রেক করিতে পারিলেই, যে কোন রচনা কাব্যত্বের দাবী করিতে পারে, এমনও নহে।

জগতের সর্ব্বত্র বিবিধ রস ছড়াইয়া আছে। এমন বিষয় বা বস্তু, অবস্থা বা ব্যবস্থা কিছু নাই, যাহাতে কোন না কোন একটা রস স্বল্পবিস্তর ফুটিয়া না উঠে; কিন্তু তাই বলিয়া এ সকলই যে কাব্যের উপাদান, এমন নহে। হাসি-কান্না সংসার জুড়িয়া আছে; কিন্তু সকল হাসি-কান্নাতেই কাব্য গঠিত হয় না। শৃঙ্গারাদি স্থায়ী রসও জনসমাজকে নিয়ত চঞ্চল ও সরস করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু এ সকলের সকলগুলিতেই যে কাব্য সৃষ্টি হয়, বা হইতে পারে, এমনও নহে। সন্তানবতী রমণী সংসারে অসংখ্য। সন্তানবাৎসল্যও স্বল্পাধিক সকল মাতার মধ্যেই ফুটিয়া আছে। এ রস—বিশিষ্ট, বিশ্বজনীন নহে। সকল মাকে দেখিয়াই গণেশজননীর বা ম্যাডোনার ভিতরে দৈবপ্রতিভাশালী শিল্পী যে অদ্ভুত রস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার আস্বাদন পাই না। র‍্যাফেল বিশাল বিশ্বের বাৎসল্যকে ছাঁকিয়া, সেই রসে অমৃতময়ী জননীমূর্ত্তির রচনা করিয়াছেন। মা বস্তু—রসময়, রসাত্মক। ম্যাডোনা এই রসের মূর্ত্তি। বাৎসল্য

রস যেমন বিশ্বজনীন, সে রসের সত্য মূর্ত্তিও সেইরূপ বিশ্বজনীন হওয়া চাই। এই রসের যে মূর্ত্তি, তাহা শ্বেত কৃষ্ণ, হিন্দু ম্লেচ্ছ—সকলেরই প্রকৃত জননীমূর্ত্তি। ম্যাডোনা সকলের মা। আর ম্যাডোনার অঙ্কে যে অপরূপ শিশু, প্রভাত-অরুণের আভা অঙ্গে মাখিয়া মাতৃবাহুলীন হইয়া আছে, সেও কোন ব্যক্তিবিশেষের সন্তান নহে, সে বিশ্বের সন্তান। বিশাল বিশ্বে অগণ্যকোটী জীবের শরীর-মনের ভিতর দিয়া যে বাৎসল্য নিয়ত প্রবাহিত হইয়া অনন্ত জীবপ্রবাহকে রক্ষা করিতেছে, ম্যাডোনা সেই নিখিলবিশ্বের মাতৃশক্তির প্রতিচ্ছবি। আর তাঁহার কোলের এই শিশুটী বিশ্ববাৎসল্যের উপজীব্য ও উদ্দীপনা—সন্তানাবতার। এই বিশ্ব-সম্বন্ধটীকে বিশদ করিয়াই ম্যাডোনার রসমূর্ত্তি হইয়াছে।

এই বিশ্ব-সম্বন্ধটীও কাব্যের একটি অপরিহার্য্য লক্ষণ। বাক্য এক দিকে যেমন রসাত্মক হইবে, অন্য দিকে সেই রসও আবার বিশ্বজনীন হওয়া আবশ্যক। রসাত্মকতার ন্যায় এই বিশ্বজনীনত্বও কাব্যের বিশেষ লক্ষণ। ইহার একটীকেও ছাড়িলে কাব্যের কাব্যত্ব থাকে না। ফলতঃ যে কাব্য কোন না কোন রসের বিশ্বজনীনত্বকে ফুটাইয়া তুলে না, তাহা যতই কেন শ্রুতিমধুর বা চিত্তোন্মাদকর হউক না, সে কাব্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা দূরে থাকুক, আদৌ কাব্যত্বেরই দাবী করিতে পারে না।

লোককে হাসান, কাঁদান, মাতান, এ সকল যে বড় একটা বেশী কথা, তাহা নহে। হাস্যরসের অবতারণা করে বলিয়া মুখবিকৃতিকে কেহ কাব্যসৃষ্টি বলে না। আর ইহা কাব্যসৃষ্টি নয়,—কারণ, হাস্যরসের যে একটী বিশ্বজনীনতা আছে, সে গুণটী এখানে ফুটিয়া উঠে না। সেইরূপ লোককে কাঁদানও সহজ; কিন্তু সেই কান্নার ভিতরে বিশ্বব্যাপী যে ক্রন্দনরোল দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহার সুর জাগাইয়া তোলা কঠিন। আর যতক্ষণ না সে সুর জাগিতেছে, ততক্ষণ

ক্রন্দনের মধ্যে কারুণ্য জাগে না, আর সে কান্নাতেও কাব্যসৃষ্টি হয় না। মারামারি ব্যাপারটা যে রসাত্মক, ইহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু ইহার ছবি বা বর্ণনাকে কেহ কি কখন কাব্য বলে? বার বৎসর পূর্ব্বে, ব্রিটিশ-বুয়র যুদ্ধের সময় রডিয়ার্ড কিপ্‌লিং এইরূপ অনেক কবিতা ও গান লিখিয়া ইংরেজ জাতিকে একেবারে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিয়াছিলেন কিপ্‌লিং-এর আর কোন কবিতা বাঁচিবে কি না জানি না; কিন্তু এগুলি যে বাঁচিবে না, ইহা স্থিরনিশ্চিত। স্বদেশীর উত্তেজনার ও উদ্দীপনার মুখে ছোট বড়, নূতন পুরাতন, কত বাঙ্গালী কবি কত গান রচিয়াছিলেন; সে সময়ে সেগুলি কতই না প্রভাববিস্তার করিয়াছিল! উত্তেজনার জোয়ারের মুখে সেগুলি ভাসিয়া আসিয়াছিল, অবসাদের ভাটার মুখে তাহারা আপনি সরিয়া গিয়াছে! সেগুলি জাতীয় জীবনের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হইলেও, জাতীয় সাহিত্যের স্মৃতিমন্দিরে কখন স্থায়িত্বলাভ করিবে না।

আবার এই স্বদেশীর মুখেই দু'চারিটী সঙ্গীতে বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' তাহাদের অন্যতম। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ', বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই দুইটী সঙ্গীতই প্রকৃত কাব্য। 'সোনার বাংলা' ও 'আমার দেশ' উভয়েরই দেবতা এই বঙ্গভূমি, সত্য; কিন্তু বঙ্গমাতৃকাকে আশ্রয় করিয়া ইঁহাদের কবিপ্রতিভা যে রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বঙ্গের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নহে। ফলতঃ রসমাত্রই বিশিষ্ট আধারে ফুটিয়া উঠে। বিশেষ দাসে দাস্য, বিশেষ সখায় সখ্য, বিশেষ পিতায় কি মাতায় বৎসল্য, নায়ক বা নায়িকা-বিশেষে মধুর রস ফুটিয়া উঠে। এই সকল বিশিষ্ট-আধার-বর্জ্জিত হইয়া কোন নিরাধার, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও সার্ব্বজনীন দাস্য, বা সখ্য, বাৎসল্য বা মাধুর্য্য রস জগতে কুত্রাপি নাই। এই সকল বিশিষ্টের মধ্যেই বিশ্বজনীন রসমূর্ত্তি প্রকট হয়, বিশিষ্টের বাহিরে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে কেবল বাঙ্গালার

কথাই বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে মার বন্দনা করিয়াছেন, তিনি এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, সপ্তকোটী সন্তানজননী বঙ্গভূমি। তথাপি এই বিশাল ভারতভূমির যে যেখানে এই গান শুনিয়াছে, এবং তাহার অর্থবোধ করিতে পারিয়াছে, সে-ই ইহাকে আপনার দেশমাতার বন্দনা বলিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ সপ্তকোটী কাটিয়া ত্রিংশৎকোটী করিয়াছেন, জানি; কিন্তু এরূপ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে কবি যে সুরটী গাহিয়াছেন, তাহা কেবল বাঙ্গালার দেশমাতার বন্দনাগীতি নহে, কেবল ভারতের দেশমাতার বন্দনাগীতিও নহে, তাহা বিশ্বজনীন দেশভক্তির নিত্যসাধ্য ও নিত্যসিদ্ধ সুর। এ সুর যে গ্রামেই গাউক, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে নিত্যকাল বাজিয়াছে ও বাজিতেছে।

ফলতঃ দেশকালপাত্রাদির বিশেষত্ব কদাপি কোন কাব্যের বিশ্বাত্মকতা বা বিশ্বজনীনতা নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করে না। এই সকল বিশেষত্ব বা বিশিষ্টকে লইয়াই এই বিশাল বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। এই সকল বিশিষ্টের সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ—অঙ্গাঙ্গী। বিশ্ব অঙ্গী, যাহা কিছু বিশিষ্ট—তাহা এই অঙ্গীর অঙ্গ। অঙ্গীতে অঙ্গ সকল প্রতিষ্ঠিত। আবার অঙ্গেও অঙ্গী—অঙ্গের কর্ম্মের প্রেরণারূপে নিগূঢ়ভাবে নিত্য বিরাজিত। অঙ্গী অঙ্গকে ছাড়িয়া থাকে না, অঙ্গও অঙ্গীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তবে অঙ্গ কখন কখন মোহবশতঃ আপনাকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবিয়া অঙ্গীকে উপেক্ষা করে। তখন অঙ্গে অঙ্গীর সুর বাজিয়া উঠে না। তানপুরার কোন একটা তার, যদি অপর তারগুলির সঙ্গে সঙ্গতি না রাখিয়া, আপনার একটা নিজস্ব ঝঙ্কার তুলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে যেমন বেসুরা হইয়া পড়ে, সেইরূপ মানুষও যখন বিশ্বসঙ্গীতের অপরাপর তারের সঙ্গে সঙ্গতি না রাখিয়া কেবল আপনার ক্ষুদ্র বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন সুরটী

ভাজিতে থাকে, তখন সেও বিশ্বজনীন জ্ঞান ও রসের ধারা হইতে সরিয়া গিয়া অজ্ঞান ও অরসিক হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া বঙ্গমাতারই বন্দনা করিয়াছেলেন, সত্য; কিন্তু তাঁহার মানস-নেত্রোদ্ভাসিতা দেবপ্রতিমা নামরূপের দ্বারা পরিচ্ছিন্না হইলেও, তিনি যে দেবতার বন্দনা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বের দেবতা; বিশিষ্ট দেশের বা বিশিষ্ট কালের নহেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' সম্বন্ধেও এই কথা। এই সঙ্গীতে কবি বাঙ্গালার জীবনেতিহাস গাঁথিয়া দিয়া, বাঙ্গালীর নিকটে ইহাকে অদ্ভুত সত্যোপেত, বস্তুতন্ত্র ও শক্তিশালী করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেগুলি মূল রসের আলম্বন ও উদ্দীপনা মাত্র। সেই রস ফুটিয়াছে,—

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ—

এই অপূর্ব্ব ভক্তির উচ্ছ্বাসে, এই অপূর্ব্ব ত্যাগে ও স্পর্দ্ধায়। আর ফুটিয়াছে যখন কবি দেশমাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।

এই ভাব ও ভক্তি কোন দেশে বা কালে আবদ্ধ নহে; ইহা স্বদেশপ্রেমিকের সাধারণ ও সার্ব্বজনীন ভাব। রবীন্দ্রনাথের অনেক স্বদেশসঙ্গীত আছে; তাহার কোন কোনটীর্তে যে বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজে নাই, এমন নহে। কিন্তু যে তেজ, যে গর্ব্ব, যে স্পর্দ্ধা, যে ভক্তি, যে নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তা ও নিঃশেষ আত্মদান দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় আর কোথাও জাগে নাই। বিশ্বজনীনতার জন্যই এই সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য।

এষার বিশেষত্ব

যে কারণে বাঙ্গালা ভাষার স্বদেশসঙ্গীতের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' এইরূপ অনন্যলব্ধ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ঠিক সেই কারণেই, কেবল বাঙ্গালার নহে, সম্ভবতঃ সমগ্র সভ্যজগতের আধুনিক সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের এই এষাখানি শোকসঙ্গীতের মধ্যে একটা অনন্যলব্ধ সত্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। এ জগতে বিরহ-বিষাদ বিরল নহে। অপিচ সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত জীবন ও মরণ, আলোক ও ছায়ার ন্যায় পরস্পরে নিত্যযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। 'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্—' মর্ত্ত্যের ইহা চিরন্তন অভিজ্ঞতা, আর সেই জন্য শোকও মানুষের সাধারণ নিয়তি। যেখানে জীবন, সেইখানেই মৃত্যু; সেইরূপ যেখানে ভালবাসা, সেইখানেই বিরহ ও শোক। যেখানে এ সংসারের দুটী প্রাণীতে কোন প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া তুলে, সেইখানেই, বরুণের ন্যায়, মৃত্যুর ছায়া ও শোকের নিঃশ্বাস, তৃতীয় হইয়া তাহাদের মাঝে আসিয়া দাঁড়ায়। জীবনের মাঝখানেও আমরা মৃত্যুকে ভুলিতে পারি না। মিলনের গভীরতম আনন্দালোকের মাঝখানেও বিরহের কৃষ্ণমেঘখণ্ড সকল সর্ব্বদাই উড়িয়া বেড়ায়।

সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥

এই বিরহভীতি প্রেমের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। জননী সন্তানকে বুকে ধরিয়া যখন এক চক্ষে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, তখনও আর এক চক্ষে বিরহাশঙ্কায় শোকাশ্রু ভরিয়া আসে, এবং অমঙ্গল-চিহ্ন ভাবিয়া তিনি তখন জোর করিয়া তাহা চাপিয়া রাখেন। অন্ধকার নিশীথে পেচকের ধ্বনি শুনিলে কুলকামিনীরা যেমন 'দূর দূর' করিয়া উঠেন, সেইরূপ মানুষমাত্রেই প্রিয়জনসঙ্গসুখের মাঝেও এক একবার মৃত্যুর সাড়া পাইয়া 'দূর দূর' করিয়া তাহাকে তাড়াইতে চাহে। প্রেম যেখানে যত অধিক, শোকভীতিও

সেখানে তত প্রবল। জীবনবস্তু যেমন বিশ্বজনীন, মৃত্যুব্যাপারও সেইরূপ বিশ্বজনীন; সুতরাং শোকও একটী বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতা। এমন কে আছে, যে এ সংসারে স্নেহ-প্রেমাদির আস্বাদন করিয়াছে, অথচ মৃত্যুর বিষদন্ত যাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হয় নাই? অক্ষয়কুমারের এই গীতিকাব্যের উৎপত্তি—শোকে, ইহার বিষয়—জীবনমৃত্যুর নিত্য সমস্যা। এ অভিজ্ঞতা বিশ্বজনীন। এ সমস্যা সার্ব্বজনীন। আর সেই জন্যই ইহা কাব্যসৃষ্টির উৎকৃষ্ট উপকরণ।

অনেক লোকেই এই সামান্য কথাটা বুঝে না। তাহারা ভাবে, শোক শোকার্ত্তের অন্তরঙ্গ বস্তু, তাহার নিজস্ব জিনিস। কিশোর দম্পতীর নববাসর-প্রকোষ্ঠ যেমন অপরের দ্রষ্টব্য নয়, সে প্রকোষ্ঠের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিলে মাধুর্য্যের মর্য্যাদা নষ্ট হয়, শোক ও বিরহ সেইরূপ দুনিয়াকে দেখাইবার বা জগতে জাহির করিবার বস্তু নহে, বহিঃপ্রকাশে তাহার গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হয়। সত্য ও গভীর শোক আপনার চাপে আপনি প্রাণের ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠে, এমন কি, চোখের ভিতর দিয়াও গলিয়া বাহির হয় না, মুখে ব্যক্ত হওয়া ত দূরের কথা। শোকের প্রথম প্রকোপে তাহাই হয় বটে। কিন্তু এই জমাট নীরব নিরশ্রু শোক তখন কেন্দ্রীভূত, ব্যক্তিবিশেষের অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ প্রাণের মধ্যে নিষ্পিষ্ট ও নিবদ্ধ। শোকার্ত্ত তখন আপনি আপনাতেই নিমগ্ন, আপনার মায়ায় আপনি দৃষ্টিহীন, আপনার ক্ষুদ্র-সুখ-দুঃখের ভাবে ও ভাবনায় আপনি আচ্ছন্ন। শোকবস্তু যে কেবল তাহার নিজের নহে,—সকলের, জগতের, বিশ্বের—বিধান; এ কথা তখন সে ভুলিয়া গিয়াছে। স্বজনবর্গ যত তাহাকে নিজের আলোহীন, বায়ুহীন, নিটোল, 'আমি'ত্বের সূচ্যগ্রপ্রমাণ ছিদ্র হইতে বাহিরে আনিতে চাহেন, ততই সে জোর করিয়া সেই বিবরে আরও লুকাইতে চাহে। এইরূপ যে লোক শোককে আমারই নিজস্ব

ভাবে, সে কদাপি তাহার বিশ্বজনীনতা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই শ্রেণীর শোক তামসিক; ইহা ভ্রমপ্রমাদাদিপ্রসূত। এই শোক দেহসর্ব্বস্ব ও অহংসর্ব্বস্ব। এই স্থূল ও জড় বস্তু লইয়া কোমল কাব্যের সৃষ্টি সম্ভবপর নহে।

কিন্তু শোকের আর একটা দিক আছে। শোকের আঘাতে মানুষ যেমন কখন কখন দৃষ্টিহীন হয়, সেইরূপ কখন কখন দিব্যদৃষ্টিও লাভ করে। যে স্নেহ, যে প্রেম, যে সেবা জীবনে এক আধারে নিবদ্ধ ছিল, মৃত্যু যখন সে আধার হরিয়া লয়, তখন নিরাশ্রয় প্রেম প্রথমে কিছুকাল হাহাকার করে বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা ক্রমে বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে, এমনও দেখা গিয়াছে। ফলতঃ বিশ্ববিধানে ইহাই শোক ও বিরহের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট নিয়তি। এই নিয়তি লাভ না করিলে, শোক ও বিরহ কদাচ সম্যক সফলতা লাভ করে না। আর শোক যখন শোকার্ত্তের ক্ষুদ্র জীবনের সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়,—তাহার দুঃখ যখন জগতের দুঃখ, তাহার বেদনা যখন বিশ্বের বেদনা, তাহার সমস্যা যখন বিশ্বের সমস্যা হয়, তখন সে শোক কাব্যের উপযোগী উপাদান হইয়া উঠে। অময়কুমার তাঁহার এষাকে যে শোকের উপর গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা এই বিশ্বজনীনতা লাভ করিয়াছে। এই জন্য যাহা তাঁহার নিতান্ত নিজের কথা ও নিজের ব্যথা, তাহাও 'তোমার আমার সকলেরই' কথা ও সকলেরই ব্যথা হইয়া পড়িয়াছে। এষার শ্রেষ্ঠত্বের মূল তত্ত্বটা এই। কবি এখানে সমস্ত মানবজাতির সঙ্গে একাত্ম হইয়া সমস্ত মানব-প্রাণের সঙ্গে সঙ্গতি মিলাইয়া আপনার শোকগাথা গাহিয়াছেন। তাই তাঁহার এষার মধ্যে প্রত্যেক শোকার্ত্ত পাঠক আপনাকে দেখিতে পাইয়া, এবং আপনার অন্তরের শোকের বা শোকস্মৃতির বিশ্বজনীনত্বটুকু উপলব্ধি করিয়া, চকিত, স্তম্ভিত ও পুলকিত হইয়া উঠেন।

পরলোকের কল্পনা

জীবন-মরণের সমস্যা মানব-সমাজে নূতন নয়, চিরদিনই মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া দিশাহারা হইয়াছে, জীবনের প্রহেলিকাও ভেদ করিতে পারে নাই, মৃত্যুর মর্ম্মও উদ্ঘাটন করিতে পারে নাই। বর্ব্বর সাধনার শৈশব-কল্পনা এ পারের ছবিগুলিকে ওপারে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা পরলোক রচনা করিয়া লইত, এবং সে লোকের যাত্রীদের সঙ্গে তাহাদের নিত্যব্যবহার্য্য অস্ত্রশস্ত্রাদি, ক্রমে গোমেষাদি, এবং পরে তাহাদের দাসদাসী, এমন কি, জীবনসঙ্গিনীদিগকেও পাঠাইয়া দিবা কর্ত্তব্য নিশ্চিন্ত হইত। আমরা আর এসকল করি না বটে, কিন্তু এখনও অনেকেই যে একটা কল্পিত পরলোকের সৃষ্টি করিয়া শোকে সান্ত্বনা অন্বেষণ করে ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। তাহারা একটা স্থূল সাকার পরজগৎ কল্পনা করিত; আমরা একটা সূক্ষ্ম নিরাকার পরলোক গড়িয়া, সেখানে সর্ব্ববিধ আনন্দের ও ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি—এইমাত্র প্রভেদ। ফলতঃ পরলোকতত্ত্ব পূর্ব্বে যেমন, আজিও তেমনই অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু এ সমস্যা অত্যন্ত পুরাতন হইলেও, যুগে যুগে মৃত্যু মানুষকে নূতন নূতন ভাবে ব্যাকুল করিয়া তুলে। বর্ব্বর সাধনার অজ্ঞ অপূর্ণতা যাহাই থাকুক, বর্ব্বর-সমাজের শ্রদ্ধা অত্যন্ত কোমল, এবং কল্পনা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিধাতা পুরুষ যেন সেই শ্রদ্ধা ও কল্পনার দ্বারাই বর্ব্বর-সমাজের অজ্ঞতা ও অক্ষমতার ক্ষতিটা পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা এখন যাহাকে জড় বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি, তাহারা সেই জড়েরই ভিতর চৈতন্যের অধ্যাস করিয়া বিশ্বসংসারকে সচেতন রাখিত। জড়ে ও জীবে তখন এমন একটা মাখামাখি ছিল, এমন একটা আলাপ-আত্মীয়তা, আদান-প্রদানের ভাব ছিল, যাহা এখন আমরা কেবল কবি-কল্পনার মায়িক সৃষ্টিতেই দেখিতে পাই, দৈনন্দিন জীবনে

অনুভব করিতে পারি না। আমরা আর প্রাচীন দেবতাদের দ্বারা নৈসর্গিক বিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করি না। আমাদের জড়বিজ্ঞান ও শক্তিবাদ পুরাতন দেবতাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। আমরা বিশ্ব বিবর্ত্তনের অন্তরালে ভিন্ন ভিন্ন লীলা প্রত্যক্ষ করি না, কিন্তু এক ভীষণ ও বিরাট্ শক্তিপুঞ্জের লক্ষ্যহীন সংঘর্ষণ এবং সংগ্রামেরই প্রতিষ্ঠা করি।

প্রাচীন দেববাদের নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের পরলোক বিষয়িণী কোমল শ্রদ্ধাটুকুও হারাইয়াছি। তাঁহারা মৃত-দিগের জন্য চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, দেবলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকলে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা শোকে অশেষ সান্ত্বনা লাভ করিতেন। আমাদের সে বিশ্বাস নাই; সুতরাং মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া আমরা আজ যত অধীর হই, মৃত্যু আমাদিগকে যতটা নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়া যায়, প্রাচীনেরা তত অধীর হইতেন না; মৃত্যু তাঁহাদিগকে এতটা কার্পণ্যোপহত করিতে পারিত না। প্রাচীনেরা যেমন পরলোকের কল্পনা করিতেন, আমরা যে তাহা একবারেই করি না, এমনও নহে। কিন্তু তাঁহাদের সে কল্পনার সঙ্গে তাঁহাদের সমসাময়িক সাধনার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ও সঙ্গতি ছিল। আমাদের পরলোক-কল্পনার মধ্যে সে যোগ ও সঙ্গতি থাকে না, এই জন্য অনেক সময় আমাদের শোক লঘু ও সান্ত্বনা অলীক হইয়া পড়ে।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মৃতদিগের জন্য আপন আপন কর্ম্মোচিত লোক নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সাধু-অসাধু, ভক্ত-অভক্ত নির্ব্বিশেষে সকলেই যে ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইত, এমন অদ্ভুত কল্পনা তাঁহারা করিতেন না। এই জন্য তাঁহাদের পরলোক তত্ত্ব কল্পিত হইলেও, সে কল্পনার অন্তরালে একটা সত্য ও সংযম বিদ্যমান ছিল। শ্রদ্ধা যেখানে—সংযম সেখানে আপনা হইতেই আসে। আর ইহলোকের যন্ত্রণ ধারণা যেখানে সহজ ও সরল, অথচ

দৃঢ় থাকে, সেথানে পরলোকের কল্পনাও নিতান্ত সত্যভ্রষ্ট হয় না। আমাদের দৃষ্টের ধারণা যেমন দুর্ব্বল, অদৃষ্টের কল্পনাও সেইরূপ অলীক হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক কবিদিগের পরলোক চিত্রে এই জন্য অনেক সময় বস্তুতন্ত্রতার লেশমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা জীবিতকে তেমন সমগ্র প্রাণ দিয়া আঁকড়িয়া ধরি না বলিয়াই, মৃতের প্রজ্বলিত চিতালোকে দাড়াইয়া গলা ছাড়িয়া গাইতে পারি,—

> যাও রে অনন্তধামে মোহমায়া পাশরি,
> দুঃখ আঁধার যথা কিছুই নাহি।
> জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
> কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি।

অক্ষয়কুমারের শোকগাথায় কোথাও এরূপ কোন অলীক কল্পনার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

অক্ষয়কুমার তত্ত্বদর্শী সিদ্ধপুরুষ নহেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিবাক্যে যে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, অক্ষয়কুমার এ পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। করিলে এ কবিতাগুলি তিনি লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু সে তত্ত্ব কয় জনের ভাগ্যেই বা প্রকাশিত হয়? সে তত্ত্বের উপদেষ্টা দুর্লভ; উপযুক্ত অধিকারী শ্রোতাও তদধিক দুর্লভ। 'দেবৈরত্রাপি পুনঃ বিচিকিৎসিতা পুরা—' অতি প্রাচীনকাল হইতে দেবতারাও এ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। 'নহি সুবিজ্ঞেয় মণুরেষ ধর্ম্মঃ—' এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব মনুষ্যদিগের পক্ষে সুবিজ্ঞেয় নহে। অক্ষয়কুমার এই দেবদুর্লভ তত্ত্ব আয়ত্ত করেন নাই, এ কথা বলিলে কেবল এই তত্ত্বেরই মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্ষয়কুমারের কবিপ্রতিভার বা মনীষার কোন অবমাননা করা হয় না। ইদানীন্তন কালে সভ্যজগতে যে শিক্ষাদীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, অক্ষয়কুমার তাহাই লাভ করিয়াছেন। তিনি একালেরই কবি ও মনীষী। এ

কাব্যটা যুক্তিপ্রধান, অতিশয় প্রত্যক্ষবাদী। এ কাব্যের শিক্ষা ও সাধনার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ,—ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপরেই বিশেষভাবে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধনা আপনাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং তর্কের দ্বারা যে তত্ত্ব লাভ করা যায় না, অক্ষয়কুমার সে তত্ত্ব লাভ করেন নাই, ইহা নিন্দার কথা নহে। বরং অক্ষয়কুমার এই অতর্কপ্রতিষ্ঠ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার না পাইয়াও যে ইহার কল্পিত উপদেশ দিতে যান নাই, ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রশংসার কথা।

আধুনিক কবিতা ও এষা

এই গ্রন্থে (এক দিকে যেমন কোন গভীর তত্ত্বদর্শিতার প্রমাণ পরিচয় নাই, অন্য দিকে সেইরূপ কোন প্রকার লঘুচিত্ততার নাম-গন্ধও নাই।) লঘুচিত্ত লোকেই কেবল মায়িক কল্পনার গোলাপী নেশা করিয়া, নানাবিধ জল্পনার সাহায্যে আপনার শোকে সান্ত্বনা অন্বেষণ বা লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ লঘুচিত্তের উপর শোকের দাগ কখন গভীরভাবে পড়ে না। তাহার প্রেম যেমন হাল্‌কা, শোকও সেইরূপ হাল্‌কা; আর সে শোক কদাপি সর্ব্বগ্রাসী হয় না। সে শোকের আঘাত জীবন-মৃত্যুর গভীর ও জটিল সমস্যাকে জাগাইয়া তুলিতে পারে না। অক্ষয়কুমারের প্রেম প্রগাঢ়, বিচ্ছেদ দুর্ব্বিষহ, শোক সর্ব্বগ্রাসী। তাই এই শোকের আঘাতে তাঁহার পুরাতন জগৎটা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সমগ্র বিশ্বসমস্যাকে নূতন ও বিরাট্ আকারে, তাঁহার চক্ষের উপরে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, (কোন রস যতক্ষণ না গাঢ় হইয়া উঠে, ততক্ষণ তাহার নিজস্ব রূপ সুস্পষ্ট হইয়া ফুটে না। যেখানে কোন বিশেষ রস, কোন ক্ষেত্রবিশেষে, তাহার নিজস্ব রূপগুলিকে ফুটাইয়া তুলে, সেখানেই তাহা আপনার বিশিষ্ট আধারের সঙ্কীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করিয়া,

সার্ব্বজনীন ও বিশ্বজনীন হইয়া উঠে। একের রস তখন সকলের রস, একের ভয় ও ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ ও শঙ্কা—তখন বিশ্বের ভয় ও ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ ও শ্রদ্ধা হইয়া পড়ে। দর্পণে লোক যেমন আপন আপন মুখ দেখিয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল রসচিত্রের মধ্যে বিশ্বজন আপন আপন অন্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব রসের—রূপের ও স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিস্মিত, পুলকিত, মুগ্ধ ও তৃপ্ত হয়। এইরূপ কাব্যসৃষ্টিই রসবিচারে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়। শোকচিত্রের মধ্যে, এই গুণেই এষাখানি অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

এষার প্রথম ও প্রধান গুণ—ইহার অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা। কবি আপনার জীবনের—বাহিরের ও ভিতরের অতি ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত অভিজ্ঞতার উপর এই কবিতাগুলি গড়িয়াছেন। যে যেমন দেখে, সে তেমনি আঁকে। চিত্রের অস্পষ্টতা চিত্রকরের দৃষ্টির অক্ষমতাই সপ্রমাণ করে। এষার চিত্রগুলিতে কোথাও এরূপ অস্পষ্টতা দেখিতে পাই না, ইহার মধ্যে কোথাও কিছুই দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য নাই। অক্ষয়কুমার সুকুমার গোধূলিলগ্নে তাহার কবিতাসুন্দরীর অবগুণ্ঠনখানি ঈষদপসৃত করিয়া, সেই আলো-আঁধারের ইন্দ্রজালের মধ্যে, তাহার অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি কাব্যেরই সৃষ্টি করিয়াছেন। সুললিত শব্দ সাজাইয়া ইন্দ্রসভার অনিন্দ্য সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া, কবিতার নামে কেবল মোহিনী হেঁয়ালির রচনা করেন নাই। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শের অনুকরণ না করিয়া, প্রাচীন কবিকুলশিরোমণিদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র, ইঁহাদের কেহই কাব্যের ছল করিয়া হেঁয়ালি রচেন নাই। সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞের মত কেবল শব্দহীন রাগরাগিণীর আলাপ

করেন নাই। হেঁয়ালি জিনিসটা হেয় নহে, উৎকৃষ্ট সুনিপুণ হেঁয়ালি সাহিত্যভাণ্ডারের রত্নবিশেষ, সন্দেহ নাই। রাগিণীর অনর্থক আলাপও নিষ্ফল হয় না, কিন্তু সে সকল কবিতা নহে।

বৈষ্ণব কবিতা ও ভাষা

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা সার্থক অথচ সরল ভাষা, সুললিত অথচ গভীর ভাবদ্যোতক শব্দ যোজনা করিয়া সজীব চিত্র সকল রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কবিতাগুলি পড়িলেই মর্ম বুঝা যায়, তাহাতে অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য কিছুই নাই। তাঁহাদের রসানুভূতি সত্য ও গভীর ছিল বলিয়াই, এই সকল অনুপম রসচিত্রও এমন অদ্ভুত ভাবে এত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। এমন সকল আন্তরিক রসানুভূতি আছে, যাহাকে কোন ভাষায় ভাল করিয়া প্রকাশ করা যায় না, ইহা সত্য। সে সকলকে কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতে হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ এই সকল গভীরতম রসের রূপও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা কেমন সরল ও সুষ্ঠু, কেমন সুন্দর অথচ রসিকজনের নিকট কেমন সহজবোধ্য!

অক্ষয়কুমারের কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের সেই গভীর রসানুভূতি আছে, এমন কথা বলি না। বৈষ্ণব কবিগণ যে বিরহের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কোন কিছু জগতের আর কোন সাহিত্যে আছে বলিয়া শুনি নাই। সুরার সঙ্গে যেমন জলের তুলনা হয় না, বৈষ্ণব কবিগণের বিরহচিত্রের সঙ্গে অপরেরও সেইরূপ কোনই তুলনা হয় না। অক্ষয়কুমারের বিরহ কেবল বিরহ, তাহার মধ্যে সেই নিগূঢ়তম মিলনের অনুপম আনন্দটুকু লুকাইয়া নাই। বিরহের দশদশার সন্ধান অক্ষয়কুমার এখনও পান নাই; তাহার তন্ময়ভাব এখনও আস্বাদন করেন নাই। অক্ষয়কুমারের কাব্যে বৈষ্ণব-কবিতার সেই নিগূঢ় রসানুভূতি ফুটিয়াছে, এমন কথা বলি না। এ কালে তাহা

ফুটিতে পারে না। আবার যদি সে সহজ সাধনা ও সহজ প্রেম কখন জাগিয়া উঠে, তবে হয় ত কোন দিন বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণবকবি কুলগুরুদিগের শূন্য আসন কোন ভাগ্যবান্ সাধক-কবির দ্বারা পুনরায় পূর্ণ হইতেও পারে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের রসানুভূতি ও সাধনসম্পদ্ লাভ করিয়াও,—আপনার অধিকারে, অক্ষয়কুমারের কাব্যসৃষ্টি, সত্যে ও সারল্যে, প্রাচীন কবিকুলগুরুদিগের কাব্যসৃষ্টি অপেক্ষা বড় বেশী হীন হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের নিজেদের সময়ের ও নিজেদের সমাজের বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ়তম ও সার্ব্বজনীন তত্ত্ব ও ভাবগুলিকে আপনাদের কবিতায় গাঁথিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারও তাঁহার কাব্যে আমাদের সমসময়ের বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ় ও সার্ব্বজনীন সমস্যা ও ভাবগুলিকে অতি বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কাব্যসৃষ্টির বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

ইন্ মেমোরিয়ম ও এষা

যে সকল আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির ভিতর দিয়া আমাদিগের পিতৃপিতামহগণের ইহ-জীবন গঠিত হইত, সেই সকল আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া, আর সে ভাবে আমরা মৃত্যুকে দেখিতে পারি না। তাঁহারা একান্তভাবে বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকিলেও, প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের যম-নিয়মাদির সাধনাপ্রভাবে তাঁহাদের চরিত্রে একটী অদ্ভুত যোগশক্তি প্রায়শঃ লুক্কায়িত থাকিত। তাঁহাদের শ্রদ্ধা কোমল ও সহজ ছিল, গতানুগতিককে আশ্রয় করিয়াই সে শ্রদ্ধা বাঁচিয়া থাকিত। তাঁহারা বিনা বিচারে, বিনা যুক্তিতর্কে প্রচলিত মতামতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া জীবন-যাপন করিতেন। তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা সমধিক শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্নও ছিলেন। বীর্য্যবান্ লোক কষ্টসহিষ্ণু। কষ্টসহিষ্ণুতা তিতিক্ষার একটী মুখ্য অঙ্গ ও উপাদান। মৃত্যুর আঘাত তিতিক্ষু লোককে বিশেষভাবে

বিচলিত বা বিভ্রান্ত করিতে পারে না। আমরা তাঁহাদের সে কোমল শ্রদ্ধাটুকু হারাইয়াছি; অথচ শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা প্রচলিত বিশ্বাসকে সংশোধিত ও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া, শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধারও অধিকারী হই নাই। আমাদের চিত্ত সংশয়প্রবণ, অধ্যাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ---তত্ত্বদৃষ্টি নাই বলিলেও চলে। অন্য দিকে আমরা যে কেবলই প্রত্যক্ষবাদী ও নিতান্তই জড়বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সর্বস্ব, এমনও নহে। ইন্দ্রিয়ভোগেও আমরা একান্ত তৃপ্ত নহি; কেবল ইন্দ্রিয়সুখভোগে হৃদয়ে যে নির্মমতা ও কাঠিন্য জন্মে,---সে আসুরী সম্পদও আমরা লাভ করি না। কলাবিদ্যার অনুশীলনে ও উৎকর্ষ-সাধনে, আমাদের মধ্যে একান্ত ইন্দ্রিয় সুখলালসার ভিতরেও একটী অতীন্দ্রিয়ানুভূতি অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সামাজিক জীবনের ঔদার্য্যে ও বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায়, আমাদের হৃদয় অভূতপূর্ব কোমলতা লাভ করিয়াছে। জীবনের পরিসরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখদুঃখানুভূতির শক্তিও বাড়িয়াছে। সুতরাং জীবন-মৃত্যুর সমস্যাও আমাদের নিকট এক নূতন ভাবে, নূতন অর্থে, নূতন শক্তিতে উপস্থিত হইতেছে। আমরা সহজে পরলোকে বিশ্বাস করিতে পারি না, আবার বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারি না। আমাদের বুদ্ধি একপ্রকার সিদ্ধান্ত করে, কিন্তু আমাদের প্রাণ সে সিদ্ধান্তকে ধরিয়া সান্ত্বনা পায় না বলিয়া, তাহার বিরোধী বিশ্বাসকেও আলিঙ্গন করিতে ব্যগ্র হয়। এই টানাটানিতে পড়িয়া, আমরা কখন এক দিকে, কখন বা অন্য দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি। ইহাই আধুনিক সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা,---বর্ত্তমান যুগের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ ট্র্যাজেডি। অক্ষয়কুমার তাঁহার এষাতে এই ট্র্যাজেডি অতি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ইংরেজি সাহিত্যে লর্ড টেনিসন্ তাঁহার 'ইন্ মেমোরিয়মে' এই আধুনিক ট্র্যাজেডির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আধুনিক সাধনার

এই বিশ্বসমস্যাকে আশ্রয় করিয়াই, টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম'—বিশ্বসাহিত্যে এতটা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের এষা ও টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম' একই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টি। অক্ষয়কুমার টেনিসন্ জানেন, ভাল করিয়াই পড়িয়াছেন। তাঁহার কাব্যকল্পনার কোন কোন রস, এমন কি, তাহার কোন কোন অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত এই আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালী কবি একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। এই জন্য এষায় কোথাও কোথাও 'ইন্ মেমোরিয়মে'র ছায়া পড়িয়াছে, এমনও বা মনে হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এষাখানি অক্ষয়কুমারের,—টেনিসনের নহে। ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে বাঙ্গালী কবির প্রাণের ছাপ, হিন্দুকবির যুগযুগান্তবাহী বিচিত্র জাতীয় সাধনার সহি-মোহর অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা ইংরেজি শিখিয়া টেনিসন্ বহুবার পড়িয়াছি। টেনিসনের কতকগুলি কথা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজি পড়িতে ও লিখিতে, শুনিতে ও বলিতে, সেই সকল ভাব ও ভাষা আমাদের চিন্তার সঙ্গে একেবারে জড়াইয়া গিয়াছে। তাই টেনিসনের সঙ্গে সামান্য বাঙ্গালী কবির নাম করিতে আমাদের শঙ্কা হয়; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, এষাতে টেনিসনের অনুকরণের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না।

'ইন্ মেমোরিয়মে'র সর্ব্বপ্রথম কবিতাটী বস্তুতঃ তাহার শেষ কবিতা। তাহার সহিত এষার শেষ কবিতাটীর তুলনা করিলেই, অক্ষয়কুমার টেনিসনের নিকট কতটা ঋণী, আর কতটাই বা তাঁহার কবিপ্রতিভার মৌলিক-সৃষ্টি, ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়। এই দুইটী কবিতার বিষয় ও উপলক্ষ একই। দুইটীতেই মানব-প্রাণের একটী গভীর প্রার্থনা, মানব-মর্ম্মের একটী গভীর সমস্যা,

মানব-হৃদয়ের কতকগুলি গভীর ও জটিল রসকে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। দু'এক স্থলে, কোন কোন শব্দের অনুবাদ সত্ত্বেও, কিছুতেই অক্ষয়কুমারের কবিতাটীকে টেনিসনের অনুকরণ বলা যায় না।—ইহা ভাবের আংশিক ঐক্য। অক্ষয়কুমার হিন্দুর ভাষায়, হিন্দুর ভাবে, হিন্দুর তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া তাহার কবিতাটী লিখিয়াছেন। টেনিসন্ খৃষ্টীয়ানী ভাষায়, খৃষ্টীয়ানী ভাবে, খৃষ্টীয়ানী তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কবিতা রচিয়াছেন। টেনিসনের কবিতাটী যতই সুন্দর ও সুমিষ্ট হউক না কেন, অক্ষয়কুমারের কবিতার তুলনায় লঘু—হাল্কা।

এই দুইখানি কাব্যের এই দুই আত্মনিবেদনে যে বৈষম্য, যে পার্থক্য, যে উৎকর্ষাপকর্ষ লক্ষিত হয়, এষা এবং 'ইন্ মেমোরিয়মে'র আদ্যোপান্তেই তাহা লক্ষ্য করা যায়। অক্ষয়কুমারের কবিপ্রতিভা সর্ব্ববিষয়ে টেনিসনের কবিপ্রতিভার সমকক্ষ, এত বড় কথাটা বলিতে চাহিনা। কিন্তু একটু ধীরভাবে সর্ব্বপ্রকার পূর্ব্বসংস্কার ও পক্ষপাতিত্বশূন্য হইয়া বিচার করিলে, বাঙ্গালা ভাষার এই সামান্য গ্রন্থখানি, তাঁহার 'ইন্ মেমোরিয়ম' অপেক্ষা মূল বিষয়ের আলোচনায় ও মূল রসের অভিব্যক্তিতে যে কোন অংশে হীন নহে, বরং অনেক বিষয়েই গভীরতর ও শ্রেষ্ঠতর, এ কথা কতটা নিঃসঙ্কোচেই বলিতে পারি। কথাটা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, প্রত্যেক কবিতার তুলনায় সমালোচনা করিতে হয়। সে বিচার বিস্তর সময়সাপেক্ষ। 'ইন্ মেমোরিয়ম' বহু বহু বার পড়িয়াছি, তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছি, শোকার্ত্ত হৃদয়ে মৃত্যুর অন্ধকারে বসিয়া দিবানিশি পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা জীবন-মৃত্যুর সমস্যাকে যে এষার মত এমন তন্ন তন্ন করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছে, এমন কখন অনুভব করি নাই। 'ইন্ মেমোরিয়মে' অতি সুন্দর, অতি গভীর, অতি মধুর কথা অনেক আছে; কিন্তু ভাবের ঐক্য, রসের সঙ্গতি, রচনার ঘননিবিষ্টতা বড় বেশী নাই। টেনিসন্ বহুবর্ষ ধরিয়া বিবিধ

বিষয়কর্ম্মের বিক্ষেপের মধ্যে ইহার এক একটী অংশ রচনা করিয়াছিলেন; তিনি গ্রন্থখানি যোগস্থ হইয়া, একৈকরসানুভূতিতে বিভোর হইয়া লেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার এই কাব্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা আছে। একটী রসের অভিব্যক্তি, স্তরে স্তরে একটী রসের ভাব মানুষের মনে যেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, শোকার্ত্তের চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা কিরূপ, আর বিরহরসেরই বা প্রকৃতি কি, ইহা একেবারেই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমারের এষা টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। 'ইন্ মেমোরিয়মে'র বুনুনী আলগা, এষার বুনুনী ঠাসা। শোক-কাব্যের মূল লক্ষ্য করুণ-রসের অভিব্যক্তি। টেনিসনের কাব্যে সে গভীর কারুণ্য কোথায়? অক্ষয়কুমারের এই কাব্যখানির প্রতি ছত্রে নিদারুণ, মর্ম্মস্পর্শী কারুণ্য-অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

এষার রসমূর্ত্তি

করুণরসের অভিব্যক্তিতে এষাখানি প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের বিরহগাথা ভিন্ন বাঙ্গালার অন্য সকল কবিতাকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়াই আমার ধারণা। সচরাচর শোক-কবিতায় হা-হতোস্মির বাহুল্য দেখিতে পাই; কিন্তু অক্ষয়কুমারের শোক সত্য, তাই সংযত, গভীর ও একান্ত বস্তুতন্ত্র। এই জন্য যে সকল সত্য ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া এ সংসারে শোক ক্রমে তীব্র ও পরিস্ফুট হয়, তিনি তাহারই এক একটী অপূর্ব্ব প্রতিকৃতি আঁকিয়া এই কারুণ্যকে এমন অদ্ভুতভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শোক যতই কঠোর হউক, বস্তুতঃ তাহা নির্ম্মম নহে। নির্ম্মম হইলে মানুষ সে আঘাত সহিতে পারিত না। শোকের শেল সর্ব্বদাই যেন একটু অহিফেনসার-সিক্ত হইয়া হৃদয়কে বিদ্ধ করে। এই জন্য

সে বেদনা যে কতটা, তাহা আমরা প্রথমে বুঝিতেই পারিনা। কিন্তু আমাদের শূন্যতা—পরিজনের দৈন্যরূপে যখন আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখনই শোকের স্বার্থপর আর্ত্তনাদের মধ্যে গভীর করুণা জাগিয়া উঠে। এষায়—এই ভাবেই এই অপূর্ব্ব করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ নৈপুণ্য টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়মে' নাই, কালিদাসের 'রতিবিলাপে' নাই, বেহুলার গানে নাই, রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণে' নাই। আছে কেবল কোথাও কোথাও বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের দূরবিরহ-বর্ণনায়। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে, ব্রজগোপীগণের নহে—বৃন্দাবনের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুলতা-গুল্মাদিরও যে দীনতা উপস্থিত হইয়াছিল,—তাহার সহিত শ্রীমতীর দূর-বিরহব্যাধিকে মিলাইয়া দিয়া বৈষ্ণব কবিকুলগুরুগণ এই নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। রসের যে একটী আলম্বন ও উদ্দীপনা আছে, বৈষ্ণব রসতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। রসকে তাঁহারা কেবল আস্বাদন করিতেন না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধন করিতেন। এই জন্য প্রত্যেক রসের প্রকৃতি এবং অভিব্যক্তির নিয়ম তাঁহাদের নিকট প্রত্যক্ষবৎ ছিল। জগতে আর কোন কবি সম্প্রদায় এমন করিয়া প্রত্যেক রসের—রূপের ও স্বরূপের সাধন করিয়া উহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। কিন্তু, এই যুগে জন্মিয়া, অক্ষয়কুমার যে এই নৈপুণ্য এমন করিয়া লাভ করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

এষাকে কেবল করুণরসাত্মক কাব্য বলিলেই তাহার যথাযথ বিচার করা হয় না। মনোবিজ্ঞানের (Psychology) অভিব্যক্তি-রূপেও এই কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব অল্প নহে। কবি কি আশ্চর্য্য কুশলতা-সহকারে এই পদগুলির সমাবেশ করিয়াছেন! এ কৌশল কৃত্রিম নহে, কষ্টসাধ্য নহে, নিতান্ত সহজ সিদ্ধ। শোকার্ত্ত হৃদয়ের অভিজ্ঞতা-গুলি যেমন একটীর পর আর একটী আসিয়াছিল, সেই ধারায়

অনুসরণ করিয়াই কবির শোকাহত কল্পনা যেন ভাসিয়া চলিয়াছে আর, যখন যেরূপ বাহিরে আশ্রয় জুটিয়াছে, তখন তাহাকে ধরিয়াই, কবি মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ ও আত্মস্থ হইয়াছেন। এই জন্য এই পদগুলি এমন অদ্ভুত স্বাভাবিকতায় ও সারল্যে পরিপূর্ণ। মানুষের শোকের,—বিশেষতঃ পত্নীবিয়োগবিধুর পতির মর্ম্মের—স্তরে স্তরে যে বিরহের ব্যথা জাগিয়া উঠে, তাহার একখানি পরিষ্কার, প্রামাণ্য, ধারাবাহিক ইতিহাসরূপেও এরা অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

পতিপত্নীর সম্বন্ধ কেবলমাত্র দুইটী প্রাণীকে লইয়া নহে। যতক্ষণ এই সম্বন্ধ দ্বিপাদ মাত্র আশ্রয় করিয়া রহে, ততক্ষণ পতি-পত্নী কেবল রমণ ও রমণী। এই দাম্পত্য সম্বন্ধ যতই গভীর হউক, কখনই উদার হইতে পারে না। কিন্তু পতি যখন পত্নীর মাতৃত্বকে এবং পত্নী যখন পতির পিতৃত্বকে ফুটাইয়া তুলেন, তখনই অভিনব বাৎসল্যে আচ্ছন্ন হইয়া মাধুর্য্যের মোহিনী—চিরকল্যাণী হইয়া উঠে। দ্বিপাদ প্রেম ত্রিপাদে পরিপূর্ণ হয়। * মাধুর্য্য তখন স্নেহসারে পরিণত হইয়া বাৎসল্যকে আপনার আলম্বন ও উদ্দীপনারূপে গ্রহণ করে। এই স্নেহসারস্থিত দাম্পত্যপ্রেম যখন মৃত্যুর আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তাহার শোকও স্নেহাশ্রয়-বিহীন বাৎসল্যের দৈন্য দেখিয়া আপনার তীব্রতা অনুভব করে। মাধুর্য্যের সঙ্গে বাৎসল্য তখন একই আঘাতে আহত হইয়া অপূর্ব্ব ও গভীর কারুণ্যের সৃষ্টি করে। এই অদ্ভুত ও জটিল কারুণ্যের চিত্র এখায় যেমন ফুটিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

* Love, in human wise to bless us,
In a noble Pair must be,
But divinely to possess us,
It must form a precious Three.

Goethe's Faust, Part II: Act III.

ফলতঃ, অক্ষয়কুমার এই গ্রন্থে কেবল তাঁহার নিজের শোকদগ্ধ অন্তরের চিত্র অঙ্কিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার সমস্ত পরিবার পরিজনের মর্ম্মবেদনা তাঁহার শোকাহত হৃদয়ের ছিন্ন তন্তুগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া, যেন এই কবিতাগুলিতে বারংবার মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কেবল তাহাই নহে। এই কবিতাগুলি যেন বিশ্বের সার্ব্বজনীন দাম্পত্য-বিরহের সাধারণ শোক চিত্রগুলিকেও একে একে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এগুলি কেবল কবিতা নহে, কেবল এক একটী ভাবের উচ্ছ্বাস নহে, যেন এক একটী উজ্জ্বল তৈলচিত্র,—এক একটী জীবন্ত প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মত চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে, এবং এক একটী অপূর্ব্ব কারুণ্য মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া আমাদের চিত্তপট অধিকার করিয়া বসে। কবিতাগুলির প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক বর্ণ-বৈচিত্র্য, প্রত্যেক 'খুটিনাটী' আমাদের অতি পুরাতন-পরিচিত বস্তু। চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, এই শব্দচিত্রে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রাণে যাহা ভুগিয়াছি, তাহাই এখানে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে;—পড়িতে পড়িতে সেই পুরাতন বিস্মৃত ভাবগুলি প্রাণের অন্তস্তলে সহসা নড়িয়া-চড়িয়া উঠে।

কাব্য ও চিত্র, সঙ্গীত ও ভাস্কর্য্যাদি সর্ব্ববিধ ললিতকলার উৎকর্ষের একটী অতি প্রধান লক্ষণ এই যে,—কথায় বা সুরে, প্রস্তরে বা চিত্রপটে রসবিশেষ যতটুকু ফুটে, তাহার ইঙ্গিতমাত্রে পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের মর্ম্মস্থলে, নিগূঢ় আন্তরিক অনুভূতিতে—তাহার শতগুণ অধিক ফুটাইয়া তুলে। এবার প্রত্যেক কবিতায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট। কবি একটা দুইটা কথার ইঙ্গিতে এক একটী বিশাল রসরাজ্য পাঠকের মানস-চক্ষে খুলিয়া দিয়াছেন।

এবার কবিতাগুলির দৃশ্য সাধারণ, এবং উপকরণ সামান্য। কিন্তু এই কবিতাগুলির উপজীব্য যে কারুণ্য—তাহা অলোকসামান্য। এই

সামান্য উপকরণ লইয়া অক্ষয়কুমার যে এমন সজীব, উজ্জ্বল রসমূর্ত্তি গড়িয়াছেন, ইহাই তাঁহার অলোকসামান্য কবি-প্রতিভার পরিচয়।

এষায় বিশ্বসমস্যা

এষার আর একটী দিক্ আছে। গভীর শোক কেবল রসেরই সৃষ্টি করে না, জীবন-মরণের দুর্ভেদ্য সমস্যাও জাগাইয়া তুলে। 'ইন্ মেমোরিয়মে' টেনিসন্ এই দিক্‌টাই বেশী করিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। জীবনের মর্ম্ম কি, মৃত্যুর অর্থ কি; কেন এত আশার কুহক, নিরাশার কুলিশাঘাত; কেন এত প্রেম, এত দুঃখ, এত নিস্ফল আর্ত্তনাদ? এই সকল বিশ্বসমস্যার মীমাংসা সহজে হয় না বটে, কিন্তু শোকে সমস্যাগুলি আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। রসের ন্যায়, তত্ত্বের দিক্ দিয়াও শোক বিশ্বজনীনতা লাভ করে। অক্ষয়-কুমারের এষায় পারলৌকিক বিশ্বাসের যে অটল ভিত্তি পাওয়া যায়, এমন কথা বলি না। 'ইন্ মেমোরিয়মে'ও তাহা নাই; তবে নানা দিক্ দিয়া এ সমস্যার আলোচনা আছে। আর, টেনিসন্ যেমন খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া সান্ত্বনা অন্বেষণ করিয়াছেন, অক্ষয়-কুমারও সেইরূপ নানা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে শেষে হিন্দুর তত্ত্বসিদ্ধান্তে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শোকাবেগ সংবরণ করিয়াছেন। হিন্দুর সিদ্ধান্ত যে পরিমাণে খৃষ্টীয়ান্ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গভীর,—এষার এই বিশ্বসমস্যার অভিব্যক্তিও ঠিক্ সেই অনুপাতে, টেনিসনের অভিব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গভীর বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

কলিকাতা,
১লা আশ্বিন, ১৩২০

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

৺কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল ও তাঁহার কাব্য-প্রতিভা *

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-অনুষ্ঠিত ৺কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের স্মৃতি-সভায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য পরিষদের সহৃদয় ও উদার সম্পাদক মহাশয় আমাকে অনুরোধ করেন। স্বীয় অক্ষমতা ও অযোগ্যতার কথা বিশেষভাবে নিবেদন করিয়া, আমি তাঁহার কাছ হইতে মুক্তি চাহিয়াছিলাম; কিন্তু আমার কোনও আপত্তি যখন তিনি শুনিলেন না, এবং আমার ন্যায় অযোগ্য ও অক্ষমের উপরেই এই গুরুভার অর্পণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন, তখন আমি শত প্রকারে অযোগ্য হইয়াও তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না,—বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালী জাতির অতি-গৌরবের সারস্বত-নিকেতন—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া পরলোকগত স্বজাতীয় কবির স্মৃতি-উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিবার ভার মাথায় তুলিয়া লইলাম।

বহুভাগ্যে সাধু ও সজ্জনসঙ্গ লাভ হয়। আপনাদের ন্যায় সাধু-সজ্জন ও সাহিত্য-সেবকবৃন্দের সঙ্গলাভে আমি ধন্য,—ততোধিক ধন্য যে, আজ আপনাদের সহিত একত্রে ৺বড়াল কবির স্মৃতি-পূজা করিবার অবসর লাভ করিয়াছি। ইহার জন্য আমি পরিষদের সুযোগ্য কর্ণধার ভক্তিভাজন সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুকে আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আজিকার এই স্মৃতি-বাসরে কবির সাহিত্য-কীর্ত্তির পরিচয় দিবার পূর্ব্বে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। কারণ,

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-অনুষ্ঠিত ৺কবি-বরের স্মৃতিসভায় লেখক কর্তৃক পঠিত।

কবির কার্য্য বুঝিতে হইলে, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাঁহার প্রকৃতি ও ভাবের ছায়া কি প্রকারে তাঁহার রচিত কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান লওয়া প্রথম কর্ত্তব্য। গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রের "জীবন-চরিত" লিখিতে বসিয়া সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র একদিন যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া, আমি বোধ হয়, আমার এ উক্তির সমর্থন করিতে পারি, "তাঁহার কবিত্বের একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণমাত্র, তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা কবির কীর্ত্তি, তাহা ত আমাদেরই হাতে আছে, পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে—কি প্রকারে—এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনা-দত্ত প্রধান শিক্ষা, এবং জীবনী ও সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার চোরবাগান-পল্লীস্থ শ্রীনাথ রায়ের গলিতে সুবর্ণবণিক-বংশে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। তাঁহাদের আদি নিবাস চন্দন-নগরে।

বাল্যে অক্ষয়কুমার হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা বড় বেশী অগ্রসর হয় নাই; কিন্তু তাঁহার, পাঠস্পৃহা ও পাঠানুরাগ এ শিক্ষাকে পূর্ণতর করিয়াছিল। তাঁহার এই পাঠানুরাগ পরিণত বয়স পর্য্যন্ত ছিল; কোনও ইংরাজী বা বাঙ্গালা ভাল গ্রন্থ পাইলে, তাহা পাঠ করিবার লোভ তিনি সংবরণ করিতে পারিতেন না।

পাঠদ্দশায় তিনি কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর নিকট যাতায়াত

করিতেন। এ সময়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও সুকবি প্রিয়নাথ সেন মহাশয়গণও কাব্যরসাস্বাদনের জন্য বিহারীলালের ভবনে সমবেত হইতেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অক্ষয়কুমারও বিহারীলালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতার 'দিল্লী এণ্ড লণ্ডন ব্যাঙ্কে' হিসাব-বিভাগে কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হন। বহুদিন এস্থলে কার্য্য করিবার পর উক্ত ব্যাঙ্কের কর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি North British Life Insurance Co'র আফিসে প্রধান হিসাব-রক্ষকের পদ পাইয়া তথায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি হিসাবে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এবং তাঁহার উপরিতন ইংরাজ-কর্ম্মচারীগণও তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতেন।

১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "বঙ্গদর্শনে" অক্ষয়কুমারের "রজনীর মৃত্যু" নামক সুদীর্ঘ কবিতাটী প্রকাশিত হয়। তখন সঞ্জীববাবু "বঙ্গ-দর্শনে"র সম্পাদক, এবং সুকবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর বঙ্গদর্শনের কবিতা-নির্ব্বাচন ও সেগুলি সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিবার ভার ছিল। সুতরাং অক্ষয়কুমার-রচিত এই "রজনীর মৃত্যু"র স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়া "বঙ্গদর্শনে" বাহির হয়। ইহাই বোধ হয়, অক্ষয়কুমারের প্রথম প্রকাশিত কবিতা।

ইহার প্রায় দেড়বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৯০ সালের চৈত্র মাসে তাঁহার "প্রদীপ" বাহির হইল। বাহির হইবামাত্রই বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ ইহাকে বরণ করিয়া লইলেন। এই ভাবে উৎসাহিত হইয়া ১২৯২ সালের আশ্বিন মাসে, তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "কনকাঞ্জলি" প্রকাশিত হইল। "কনকাঞ্জলি" প্রকাশের দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১২৯৪ সালে তাঁহার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "ভুল" প্রকাশিত হইল। ইহার পর ১৩০০ সালে "প্রদীপের", এবং ১৩০৪ সালে "কনকাঞ্জলি"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৩১৩ সালের ১৯শে মাঘ তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়,—পত্নীবিয়োগজনিত শোকে তিনি যে কবিতাবলী রচনা করেন, তাহা "এষা" কাব্যে প্রকাশিত হয়। এই "এষা"ই কবির শেষ প্রকাশিত কাব্য।

১৩১৭ সালে তাঁহার "শঙ্খ" এবং ১৩১৯ সালে "এষা" প্রকাশিত হয়। "এষা" জনসমাজে এতদূর আদৃত হয় যে, উহার প্রথম সংস্করণ এক বৎসর মধ্যে নিঃশেষিত হয়।

১৩২০ সালে "এষার" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, এবং ১৩১৯ সালে "প্রদীপে"র তৃতীয় সংস্করণ, ১৩২০ সালে "শঙ্খে"র দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৩২৪ সালে "কনকাঞ্জলি"র তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয়।

১৩১১ সালের বৈশাখের "সাহিত্যে" তিনি ওমারের অনুকরণে ২৭টি কবিতা-স্তবকে "পান্থ" নামক কবিতা প্রকাশ করেন। ইহার ৭ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩১৮ সালের বৈশাখের "সাহিত্যে" ঐ বিষয় আরও ২৪টী কবিতাস্তবক প্রকাশিত হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ৫৩টী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেমিক কবি "চণ্ডীদাসে"র জীবনের ঘটনাবলী লইয়া তিনি একখানি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহা তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

তাঁহার সর্ব্বশেষ-রচিত কবিতা "স্বজাতি-সম্ভাষণ", সুবর্ণবণিক সম্মিলনীর গত অধিবেশনে চুঁচুড়ায় পঠিত ও "সুবর্ণবণিক সমাচারে" প্রকাশিত হয়।

তিনি এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বিহারীলালের শিষ্য। তাঁহারা উভয়ে একত্রে বিহারীলালের কাছে কাব্য শিক্ষা করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের এই মধুর সম্বন্ধের পরিচয় "ভুলে"র "উপহার"-কবিতার ভিতর পাওয়া যায়—

"রবি—

এই জগতের দূরে—
যেন কোন মেঘ-পুরে,
তুমি আমি দুইজনে বেড়াতাম খেলিয়া।
হাতেতে দুলিছে বাঁশী
ঠোটে উছলিছে হাসি,
চারিদিক পানে চেয়ে, চারিদিক ভুলিয়া
তুমি আমি দুইজনে বেড়াতাম খেলিয়া।
পুঞ্জ পুষ্প তারা ফুল
সৌন্দর্য্য কিরণাকুল,
চেয়ে র'ত মুখপানে চারিদিকে ছাইয়া
ইন্দ্রধনু পাখা মেলি,
কত মেঘ খেলি খেলি,
লুটায়ে পড়িত পায়ে ধীরে ধীরে গাইয়া।
চেয়ে র'ত মুখপানে, চারিদিকে ছাইয়া।"

১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ অক্ষয়কুমারের গুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুতে কবি একটী কবিতা রচনা করেন, ১৩০৪ সালে, "কনকাঞ্জলি"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময়, এই কবিতাটী উৎসর্গ-কবিতারূপে উহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়।

এই কবিতাটী এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী যে, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত-শির,

কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি ;
তবু কাঁদ কাঁদ—জনমভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।
যাও, তবে যাও। বুঝিয়াছি স্থির,—
মানব-হৃদয় কতই গভীর ;
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেমপথ।
দিলে বাণীপদে লুটাইয়া শির
দলি' পদে পর-মত।

বুঝায়েছ তুমি কত তুচ্ছ যশ ;
কবিতা চিন্ময়ী, চির সুধা-রস ;
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী !
পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক্—দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী !

বুঝায়েছ তুমি, কোথা সুখ মিলে—
আপনার হৃদে আপনি মরিলে ;
এমনি আদরে দুঃখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্মপর।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্য হেরিলে
পদে লুটে চরাচর।"

অক্ষয়কুমারের হৃদয় সহানুভূতি-ভরা ছিল। তাঁহার এই

সহানুভূতির গুণে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। যখন স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় বিশেষ বিপন্ন হইয়া অক্ষয়কুমারকে পত্র লিখিলেন, তখন তিনি এই দরিদ্র কবি-ভ্রাতার দুঃখে বিগলিত হইয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তিনি পরিচিত ও অপরিচিত বহু ব্যক্তিকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি ও বন্ধুবাৎসল্য অপূর্ব্ব, ইহার পরিচয় দিবার মত দুই একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক আজ এই সভাস্থলে উপস্থিত আছেন। ভূতপূর্ব্ব "কল্পনা"-সম্পাদক সুলেখক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরোলোক-গমন করিলে পর, তিনি তাঁহার শিশু-পুত্র ও বিধবা পত্নীকে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় উদার হৃদয় কবিরই উপযুক্ত।

তিনি বেশ-ভূষা ও লোক-ব্যবহারে সাদাসিদা ছিলেন। কেহ কোন দিন তাঁহার বেশ-ভূষার কোন পারিপাট্য দেখেন নাই। তিনি অন্তরে কবি ছিলেন, কাজেই বাহিরে কবি সাজিবার কোনরূপ চেষ্টা করিতেন না।

তিনি প্রতিভাশালী কবি হইলেও, যশ বা প্রশংসা কোনদিন তাঁহাকে প্রলুব্ধ বা বিচলিত করিতে পারে নাই। সমালোচক বা পাঠকের মুখ চাহিয়া তিনি কোন দিন কবিতা রচনা করেন নাই। তাঁহার প্রথম সংস্করণের "প্রদীপে" প্রকাশিত "সমালোচকের প্রতি" শীর্ষক কবিতার একটী অংশে তিনি ইহার বেশ পরিচয় দিয়াছেন ;—

"কবি নয় চিত্রকর, ঘুঁটে ঘুঁটে নানা রঙ
ধরিবে তোমার আঁখি 'পরে।
চাবে তব মুখপানে, ভিক্ষার সজল নেত্রে
কি হয়েছে জানিবার তরে।"

তাঁহার গুরু বিহারীলাল যেমন অযথা লোকনিন্দাকে পদতলে দলিত করিয়া বাণীর চরণ-সরোজে শির লুটাইয়া দিতেন, তিনিও তেমনি—

"স্নেহময়ী প্রকৃতির   দুলালিত শিশু কবি,
যখন যা মনে ধরে তার—
খেলিবে তাহাই লয়ে,   কি হবে খেলার পরে
জানেনা, ভাবেনা তার ধার।"

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি শ্রীশ্রীবঙ্গধর্ম্ম-মণ্ডল কর্ত্তৃক "কবিতিলক" উপাধিতে ভূষিত হন।

গত ফাল্গুন মাস হইতে তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়। স্বাস্থ্যলাভের আশায় তিনি পুরী গমন করেন। কিন্তু সেখানে অবস্থার উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতে থাকায়, তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিবার চারিদিন পরে, বৃদ্ধা জননী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দুই পুত্র, তিন কন্যা ও দৌহিত্র প্রভৃতিকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠস্থিত স্বর্ণ অলিন্দায় ভর দিয়া যে বিষাদিনী নারী কাতর নেত্রে ধরিত্রীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছিলেন-আজি তিনি আসিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার করধারণ পূর্ব্বক হাসিমুখে আবার বৈকণ্ঠ-পথাভিমুখী হইলেন। যাও কবি, তোমারই ভাষায় বলি—

"এসেছিলে শুধু গাহিতে প্রভাতী
না ফুটিতে ঊষা, না পোহাতে রাতি
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি
কুহরিল ধীরে ধীরে;
একটি   ঘুম-ঘোরে প্রাণী, ভাবি স্বপ্নবাণী
এই   ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।
যা
কবি   অক্ষয়কুমার, কাঁদ বঙ্গবাসী, জলিছে শ্মশান
কত মুক্তা ছত্র, কত পুণ্য গান,

কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে।
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান্
ঐ যায় লোকান্তরে।"

অক্ষয়কুমার পাঁচখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন—"প্রদীপ", "কনকাঞ্জলি", "ভুল", "শঙ্খ" ও "এষা"। গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহার কবি প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় দিবার ক্ষমতা আমার নাই—তবে এই স্মৃতি-সভায় তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভার কিছু আভাস দিবার চেষ্টা করিব। বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যের বিশেষতঃ গীতি-কবিতায় তিনি যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার তিরোধানে সে স্থানের শূন্যতায় যে ভাব অনুভূত হইতেছে, আমি আজ তাহা আপনাদের কাছে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আশা করি, অতি অল্পায়াসেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, এ অভাব কত বড় অভাব; এবং খুব সহজে ইহা পূরণ হইবার নহে।

কবির কাব্যদ্বারাই তাঁহার অন্তরের ভাব ও সেই ভাবের বিকাশ অনুভূত হয়। অক্ষয়কুমারের "প্রদীপ" "কনকাঞ্জলি" "ভুল" "শঙ্খে" তাঁহার কবি-প্রতিভার অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু "এষা"তেই তাঁহার রচনা-মাধুর্য্যের ও কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি লক্ষিত হয়। পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী বা আত্মীয়-বিয়োগের ফলে বঙ্গসাহিত্য যে সমস্ত গদ্য ও পদ্য রচনা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, "এষা" তাহাদের মধ্যে মুকুটমণি। কেন না 'এষা' বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যজীবনের একখানি আলেখ্যকে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপান্তরে পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছে।

প্রকৃতি-বর্ণনা, প্রণয়, শোক-মিশ্রিত প্রণয়, ও শোক এই চারি শ্রেণীর কবিতারচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার "এষা" ব্যতীত অপর চারিখানি কাব্যেই এই চারি শ্রেণীর কবিতা অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছে।

তাঁহার গুরু বিহারীলাল, প্রণয় ও দুঃখের বর্ণনায় অদ্বিতীয় ছিলেন; গুরু-আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া শিষ্য অক্ষয়কুমারও, প্রণয় ও শোক-বর্ণনায় অপরাজেয় হইয়াছেন। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ কি ভাবে পরস্পরাভিমুখী হইয়াছে, তাহার পরিচয় দিতে হইলে উভয়ের কাব্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতে হয়;—

উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে একটী কথা এস্থানে প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করি—তাঁহারা উভয়েই পত্নীভাগ্যে ভাগ্যবান্ ছিলেন। প্রকৃত সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া তাঁহার অনাবিল ও নিষ্কাম স্বামীপ্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হইতে পারিলে যে অপরিসীম প্রণয়-সুখের অধিকারী হইতে পারা যায়, তাঁহারা উভয়েই সে সুখের অধিকারী ছিলেন।

বিহারীলাল বলিতেছেন—

"নয়ন-অমৃত রাশি, প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি-ফুল-হার!
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সম্মুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুম-ঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।"

পত্নীনিষ্ঠ ও 'পত্নীপ্রেম-মুগ্ধ' অক্ষয়কুমার তাঁহার পত্নীর ভিতর বিশ্বের সমগ্র নারীজাতির যে অপূর্ব্ব ও মহান্ ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন,—তাহা তাঁহার "প্রদীপের" "নারীবন্দনা" নামক কবিতার নিম্নলিখিত চারিটি পংক্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—

"তোমারি ও লাবণ্য-ধারায়
কালের মঙ্গল পরকাশ।
অসম্পূর্ণ এ সংসারে, তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
সন্ধ্যা মেঘে স্বর্গের আভাস।"

বিশেষের ভিতর দিয়া বাঙ্গালী কবি কিরূপে যে বিশ্বকে উপলব্ধি করিতে পারেন ইহা তাহারই পরিচয়, এবং আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃত প্রেম বা প্রণয় যে উৎস হইতে স্বতঃ উৎসারিত হয়, সেই পত্নীপ্রেম অক্ষয়কুমারের হৃদয় কি ভাবে অধিকার করিয়াছিল, তাহার ছবি "এষার" নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি পাঠে জানিতে পারি—

"কি ছিলে আমার তুমি, প্রেয়সী কি কৃতদাসী ?
দুটী হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি।
একান্ত আশ্রিতপ্রাণা—নাহি নিজ সুখ দুখ,
সব আশা—সব সাধ আমাতেই জাগরূক।"

"সতী,
মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি!
তুমি যাহে দেছ পদ—
সে যে ফুল্ল কোকনদ!
সে নহে শ্মশান-চুল্লী ভীষণ মুরতি।"

"প্রদীপ" কবির প্রথম গ্রন্থ। এই প্রথম রচনাতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার একটী মাত্র কবিতা "হৃদয়-সংগ্রাম" পাঠ করিলেই—আমার কথার সার্থকতা বুঝা যাইবে। অন্তরের সহিত বাহিরের এই দুর্ব্বার দ্বন্দ্বকে লক্ষ্য করিয়াই ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

মহাশয়, এই খানেই আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে Romanticism-এর জন্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সৃষ্টির একস্তরে ইহা আছে। বড়াল কবিতেও ইহা আছে।—

"কি ভীষণ চলেছে সংগ্রাম
প্রিয়জন সনে অবিরাম!
পূজ্য বৃদ্ধ পিতা মাতা, স্নেহের পুত্তলী ভ্রাতা,
সহোদরা—বালিকা সুঠাম,
তাহারাও জনে জনে, উন্মত্ত এ মহারণে!
হা জীবন, হায় ধরাধাম!
সখা সখী আত্মীয় স্বজন—
তারাও যুঝিছে অনুক্ষণ!
প্রাণাধিকা প্রাণেশ্বরী, তারও সনে যুদ্ধ করি,
সেও শত্রুসেনা একজন!
শত তপস্যার ফল এই শিশু সুকোমল,
এ-ও এক যোদ্ধা বিচক্ষণ!"

Romanticismএর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, একটা বিদ্রোহের ভাবও আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্তরের কবিতায় তাহা সুপরিস্ফুট। কিন্তু বড়ালকবির কাব্যের রূপান্তরে যে দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের ভাব ফুটিয়াছে, তাহা প্রথম হইতেই অধিক পরিমাণে আত্মস্থ। বড়ালকবি কোথাও নিজেকে হারাইয়া ফেলেন নাই। তাঁহার "প্রদীপের" "আবাহন"-কবিতা একনিষ্ঠ ও বিশ্বাসী হিন্দু সাধকের আবাহন,—এ আবাহনের অভিনবত্ব বুঝাইতে হইলে মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করিতে হয়—

হের এ প্রণবে, সতী
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড গতি,

দূর বিষ্ণুলোক হ'তে
আশীর্ব্বাদ আসে স্রোতে,
ঝর ঝর সপ্ত স্বর্গ, ঝরে শির'পর।
ক্ষুদ্র নয় তুচ্ছ নয় নর।

ইহা ইহলোক-পরলোকের সম্বন্ধ-বিশ্বাসী হিন্দুর কথা। প্রাণের দুর্ব্বার বেগে বড়াল কবি ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন।

তারপর—

এস তবে এস ভবে,
সত্যই কৃতার্থ হবে;
এ বিকচ তনু-মন
বিধাতার ধ্যেয় ধন—
দেবাসুর রণক্ষেত্র, সর্ব্বতীর্থ-সার;
উপযুক্ত আসন তোমার।

কবির সুর এথানে উচ্চ গ্রামে পৌঁছিয়াছে—"যাহা আমার অভিমান ও আমিত্বের আকর, যাহা পাপাসুর ও পুণ্য-দেবতার রণভূমি—এক কথায় যাহা আমার সর্ব্বতীর্থের সারস্বরূপ সেই তনু-মনকে তোমার উপযুক্ত আসন করিয়া দিতেছি।"

তারপর—

"এস, ভেদি' ব্রহ্মরন্ধ্র,
হে আনন্দ ভূমানন্দ।
উৎপাটিয়া মর্ম্মস্থল
সদ্যঃ রক্তে ঝল—ঝল—
এস আত্ম-বিনাশিনি, পরার্থ—জীবিতে,
সত্য-শিবে, সৌন্দর্য্য—সস্মিতে।

ইহা একেবারে একনিষ্ঠ বাঙ্গালী সাধকের কথা। ইহা চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের দেশের বাণী। ইহার পর সুর আর উঠে না।

বাঙ্গলার এই সুর ও রূপ লইয়া বড়াল কবি 'প্রদীপে'র পরে ক্রমে 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল' ও 'শঙ্খে' তাঁহার অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের বিচিত্র ভাব উল্লিখিত কাব্য-ত্রয়ে বিচিত্র সুরে ও বিচিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির সাদাসিদা জীবনের মধ্যেও কত বিচিত্র ভাবের সমাবেশ ছিল,—তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে কত বৈচিত্র্য একের পর আর দেখা দিয়াছে। পত্নী-বিয়োগের আঘাত পাইয়া কবি-হৃদয়ে যে ভাবের প্রবল তরঙ্গ উঠিল,—তাহারই আঘাতে আঘাতে, "এষা"র এক একটী কবিতার সৃষ্টি হইল। এই শোক মানব-হৃদয়ে অহোরহ আঘাত করিতেছে,—কেহ নীরবে ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তুষাগ্নিদাহনে দগ্ধ হইতেছেন, কেহ বা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া সে শোকের কতকটা লাঘব করিতেছেন। কিন্তু যিনি কবি, শোকের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার প্রাণে কাব্যস্ফূর্ত্তি হয়; তিনি এই নিদারুণ বিয়োগ-বেদনা ভাষার সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়া ইহাকে সাধারণের গোচরীভূত করেন। আবার ফুটাইবার ক্ষমতা যাঁহার যত বেশী; তিনি এই প্রকাশ-ব্যাপারে তত অধিক সিদ্ধকাম হন। বন্ধু-বিয়োগ-জনিত শোকে ব্যথিত হইয়া ইংরাজ কবি টেনিসন্ যে অপূর্ব্ব *In Memoriam* কাব্য রচনা করেন, তাহা ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। আমাদের বাঙ্গলায়—

গদ্যে—চন্দ্রশেখরের—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম
শ্রীমতী মানকুমারীর—প্রিয়-প্রসঙ্গ
স্বর্গীয়া শ্রীকুসুমকুমারীর—প্রসূনাঞ্জলির প্রথমাংশ
শ্রীমতী সরযুবালার—বসন্ত-প্রয়াণ

এবং পদ্যে—রবীন্দ্রনাথের—স্ত্রী বিয়োগের কবিতানিচয়

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের—স্ত্রীবিয়োগের কবিতানিচয়

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমারের—পত্রপুষ্প

" মুন্সী কায়কোবাদের—অশ্রুমালা

" যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর—সতীপ্রশস্তি

" সুশীলগোপাল বসুর—শোক ও শান্তি এবং ব্যথা

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর—অশ্রুকণা

শ্রীমতী সবলাবালা দাসীর—প্রবাহের কয়েকটী কবিতা

জনৈক বঙ্গনারী প্রণীত—নির্ব্বাণ,—

শোক-সাহিত্যের কলেবর পুষ্টি করিয়াছে। গদ্যে চন্দ্রশেখরের "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই এক গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি অমর হইয়াছেন। পত্নীবিয়োগ বিধুর শোকাহত স্বামীর হৃদয়ের গভীর অভিব্যক্তি। তারপর সুপ্রসিদ্ধা ও প্রতিভাশালিনী মহিলা কবি স্বামীহারা গিরীন্দ্রমোহিনীর "অশ্রুকণা" একদিন অনেকের নয়নে অশ্রুর প্রবাহ বহাইয়াছিল। অক্ষয়কুমার গিরীন্দ্রমোহিনীর "অশ্রুকণা" সম্পাদনের ভার লইয়া বিশেষ যত্ন ও কৃতিত্বের সহিত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এইবার আমরা তাঁহার "এষা"র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(যাহা শোক-সঞ্জাত, যাহা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে স্বতঃ নিসৃত, সে কবিতা পাঠ বা আলোচনা করিতে হইলে একটু সহানুভূতি ও সমবেদনা থাকা চাই। ব্যথার ব্যথী না হইলে, হৃদয় ব্যথা বুঝা কঠিন। শোকের তাড়নায় বা পীড়নে যাহার হৃদয় ব্যথিত হয় নাই, "এষা" বা "এষা" শ্রেণীর কাব্য হৃদয়ঙ্গম করা তাহার পক্ষে দুরূহ। আমার এ উক্তির অনুকূলে ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহ যে মত দিবেন না তাহা জানি,—তবুও আমি বলিতেছি যে, পুত্র বা পত্নীশোকের আঘাত যাহারা পান নাই—শত

কাব্য রচনা করিয়াও তাঁহাদের সে শোকের প্রাণঘাতী ও মর্ম্ম-বিদারক যাতনা বুঝানো যায় না তবে সহানুভূতি ও সমবেদনা বলিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এমন দুইটী সুকোমল বৃত্তি আছে, যাহার সাহায্যে আমরা এই শোকের সামান্যাংশ বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। আমাদের কবি অক্ষয়কুমারও বহুপূর্ব্বে শোকের কোন প্রাণঘাতী আঘাত না পাইয়াও স্বামীবিয়োগকাতরা গিরীন্দ্রমোহিনীর "অশ্রুকণা"গুলি সাজাইয়াছিলেন, কিন্তু "এষা"র কবিতাগুলি যেন তাঁহার বুক ফাটিয়া বাহির হইয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য "এষা" অক্ষয়কুমারের শেষ রচনা। এই 'এষা' রচনার পূর্ব্বে, তিনি যে সমস্ত শোকের কবিতা লিখিয়াছিলেন, তদ্বারা ইহা জানিতে পারি যে, শোক-কবিতা রচনায় কবি দক্ষ ছিলেন। তাঁহার "শঙ্খের" "পিতৃহীন" "মাতৃহীন" "বালবিধবা" প্রভৃতি কবিতায় ইহার পরিচয় পাই। তাঁহার যে প্রতিভা এই কবিতাগুলির ভিতর দিয়া ফুটিবার চেষ্টা করিতেছিল, "এষা"য় তাহা একেবারে পূর্ণবিকশিত হইয়াছে।

শোকের নিদারুণ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কবিরচিত শোককাব্য পাঠ করিলে তাঁহার হৃদয়নিহিত শোকের লাঘব হয়, এ শ্রেণীর লোকের শোক-ক্ষতে "এষা" শান্তি-প্রলেপ প্রদান করিবে। "এষা"র মধ্যে অক্ষয়কুমারের স্বাতন্ত্র্য, কবিত্ব, প্রতিভা অন্তর্দৃষ্টি, ভাব-বিশ্লেষণ-শক্তি পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। "এষা" রচনা করিতে বসিয়া তিনি কোথাও ভাষা বা ভাবের অপব্যবহার করেন নাই, অতিরঞ্জিত দোষে "এষা"র কোন কবিতা দুষ্ট হয় নাই। বাস্তব জগতের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়াই তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার চরম বক্তব্যের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন।

"এষা"র কবিতার প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব—যাহার শোকে তিনি মুহ্যমান তাঁহার ছবি ইহার মধ্যে কবি পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহুস্থান হইতে ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, তিনি

শোকের প্রাবল্যে এবং কল্পনার আতিশয্যে তাঁহার প্রিয়তমাকে—

"সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী সতী—
চিরোজ্জ্বল দেবী-মূর্ত্তি কবিত্ব-মন্দিরে"

বলিয়া বর্ণনা করেন নাই,—বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের সেবাপরায়ণা বধূর ছবিই আঁকিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন—

"লয়ে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ মমতা ভকতি
ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র কুটীরে।"

বাঙ্গলার কবি আজ 'বঙ্গনারী' ছাড়িয়া যে 'বিশ্বনারী'র জন্য কাঁদে—বড়াল কবি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি স্বর্গের কোন দেবী চাহেন নাই। এই পৃথিবীর, এই শ্যামলা বঙ্গভূমির দরিদ্র কুটীরের এক মানবীকেই চাহিয়াছেন।

"মানবীর তরে কাঁদি যাচি না দেবতা"। কল্পনার সাহায্যে আমরা অনেকে "মানবীর" পরিবর্ত্তে অনেক প্রকার উপমা বসাইয়া থাকি; কিন্তু অক্ষয়কুমার তাঁহার মানবী পত্নীর জন্যই কাঁদিতেছেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে তিনি কোন দেবী প্রার্থনা করেন নাই। তাঁহার কাব্য বস্তুগত বস্তুতত্ত্বহীন নহে। তাহা বাস্তব—অথচ সর্ব্বোচ্চ আদর্শের সহিত অনুস্যূত।

বাস্তবতার কবি অক্ষয়কুমার "এষা"র বিভিন্ন স্থানে তাঁহার পত্নীর যে নিখুঁত ও অবিকল ছবি দিয়াছেন, আমরা একে একে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"উপহার" কবিতায়,—

"লয়ে সেই দিব্য দেহ
সে অতৃপ্ত প্রেম স্নেহ,
আসিছ ভাসিছ কেন সম্মুখে আমার
হাসি হাসি মুখখানি,

সরমে সরে না বাণী
আঁচলে নয়ন, রাণী, মুছি বার বার

কত যুগ যুগ পরে
এখনো কি মনে পড়ে
তোমার সে হাতে-গড়া সোণার সংসার !
করিত্ব কল্পনা ভরা
জীবন-মরণ-হরা
ত্রিভুবন আলো করা প্রীতি দু'জনার।"

পতিগতপ্রাণা, প্রেমময়ী, স্নেহময়ী সরমা পত্নীর ছবি কেমন সুন্দরভাবে উপরি উদ্ধৃত কবিতা দুইটীর প্রথমটীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়টীতে পরলোকগতার গার্হস্থ্য জীবনের মধুর স্মৃতি—তাঁহার হাতে-গড়া সোণার সংসার আর তাহার সহিত তাঁহাদের পবিত্র দাম্পত্য-প্রেমের অত্যুজ্জ্বল ছবি দেদীপ্যমান।

শোকদগ্ধ কবি গৃহদেবতাকে সম্বোধন করিতে গিয়া, এই ভাবে দেবভক্তি-পরায়ণা পত্নীর ছবি আঁকিয়াছেন—

"সে অতি প্রত্যূষে উঠি, আসিত হেথায় ছুটি,
করিত এ মন্দির মার্জ্জনা,
তুলি ফুল, গাঁথি মালা, সাজাত নৈবেদ্য ডালা,
সচন্দন তুলসী, অর্চ্চনা।
জানুপাতি কৌষেয় বসনা,
স্থির-নেত্র যুক্ত করে, ঝর ঝর অশ্রু ঝরে
তোমাপানে চাহি একমনা !

পড়ে-কি-না-পড়ে শ্বাস, সিক্ত মুক্ত কেশ-রাশ
শিথিল-অঞ্চলা স্মিতাননা।
আবার সন্ধ্যায় হেথা আসি,
দীপ দিয়া, ধূপ দিয়া, প্রণমিয়া প্রণমিয়া
ফুরাত না তার ভক্তিরাশি।
প্রহর বহিয়া যায় ধ্যান তার না ফুরায়,
কতক্ষণে উঠিত নিঃশ্বাসি।”

দুর্ভাগা বাঙ্গালীর ঘরে এই নারীশক্তি আজিও শিখার মত জ্বলিতেছে, এই যা ভরসা। কবিপ্রিয়া যে কেবল নিজেই ভক্তিপরায়ণা ছিলেন তাহা নয়;—ভক্তিমতী গৃহলক্ষ্মী স্বামীকেও ভক্তিমান্ হইতে শিখাইতেন,—হিন্দুগৃহের শোভাসম্পদ ও কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুলসীকে প্রণাম ও পূজা করিবার জন্য, তিনি স্বামাকে বলিতেন—

“বলিত আমায়, নমিতে তোমায়
দুগ্ধ পুষ্প তিল দিয়া;
তোমার নিঃশ্বাসে সর্ব্বরোগ নাশে
যায় দুঃখ পলাইয়া।”

“এষা”র “শোক” অধ্যায়ে চতুর্থ কবিতার মধ্যেও অক্ষয়কুমারের সহধর্ম্মিণীর বেশ সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সব চেয়ে যাহা সুন্দর, নারীজীবনের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই সতীনারী বাঞ্ছিত ‘পরমাগতি’ লাভ করিয়াও কবি—প্রিয়তমার—

“সপ্রেম দৃষ্টি, খুঁজিছে জগতী!”

এখানে কবির অন্তর্দৃষ্টি সেই আলোক-অন্ধকারময় সুদূর পরলোকের যব-নিকাকে ভেদ করিয়া সতীস্বর্গের শত সমারোহ ও সৌভাগ্যের মধ্যে অবস্থিতা পত্নীর ছবি, কি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। মর্ত্ত্যের মঙ্গল-

কাজ্ক্ষিণী জীবনসঙ্গিনী, পরলোকে গিয়াও পরলোকপতির কাছে তাঁহার মর্ত্ত্যস্থিত স্বামীদেবতার জন্য করুণা স্নেহ ও শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন।—

"এখনো সে যুক্ত করে
মাগিছে আমার তরে
তোমার করুণা স্নেহ, শুভ আশীর্ব্বাদ।"

এইখানেই কবির সুর চরমে উঠিয়াছে, পরলোক-বিশ্বাসী কবি ত্রিকালদর্শী ঋষির মত, পরলোকের ঘটনা পরম্পরা দেখিবার দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। পরলোকে অবিশ্বাসী আমরা,—কতটুকু দেখিতে পাই? যাহা দেখিতে পাই না,—মনে করি তাহা নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর বিশ্বাসের সমস্ত রাজ্যটা এখনও অন্ধতমসায় আচ্ছন্ন হয় নাই। বড়াল কবির কাব্য-সৃষ্টিতে আমরা তাহারি পরিচয় পাই।

ঘটনা ও ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, "এষা"র কবিতাগুলি পরে পরে সাজান হইয়াছে। অক্ষয়কুমার শোকের উন্মত্ত আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া, কোথাও থে'ই হারাণ নাই। মৃত্যু, অশৌচ, শোক, ও সান্ত্বনা—এই চারি অধ্যায়ে "এষা"র কবিতাগুলি বিভক্ত হইয়াছে। মৃত্যু, অশৌচ ও শোকের সোপানাবলী, একে একে অতিক্রম করিয়া, তিনি সান্ত্বনার নিকেতনে পৌঁছিয়াছেন। এই স্তর বিন্যাসের পরতে পরতে, পরলোক-বিশ্বাসী হিন্দুর পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে,—আর সঙ্গে সঙ্গে এই শোক-বেষ্টনীর মধ্যে, তাঁহার গৃহের নিষ্ঠা ও ভক্তি-দৃপ্ত ছবিখানি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমেই মৃত্যু অধ্যায়ে, পত্নীর অন্তিম-দশা-দর্শন-ভীতা কন্যার প্রশ্ন, ও পিতার উত্তর; তারপর পুত্রমঙ্গল-সংবাদ-শ্রবণ-তৃপ্তা জননীর শান্তিপূর্ণ মৃত্যু, মৃত্যু-সন্দেহ ও ব্যাকুলতা; ইহার পরেই একটা কঠিন সমস্যা কবি-হৃদয়কে আলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিল,—

"মরণে কি মরে প্রেম ! অনলে কি পুড়ে প্রাণ ?
বাতাসে কি মিশে গেল, সে নীরব আত্মদান ?"

বহুপরে "সান্ত্বনার" অধ্যায়ে কবি নিজেই এ সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন,—

"নয়,—এ মরণ নয়, দু'দিন বিরহ !
আলোকে সুবর্ণ ফুটে
আঁধারে সুগন্ধ ছুটে ;
মিলনে নিঃশঙ্ক প্রেম, যত্ন, অনাগ্রহ
* * *
ভাঙ্গিতে গড় নি—প্রেম, ওহে প্রেমময় !
মরণে নহি ত ভিন্ন;
প্রেম সূত্র নহে ছিন্ন;
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয় !

কবির সুর এখানে একেবারে উদাত্তে উঠিয়াছে,—ক্রম বিকাশের ফলে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

এইবার অক্ষয়কুমারের পত্নীপ্রেম, তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। প্রেমই ক্ষুদ্রকে মহৎ, কুৎসিৎকে সুন্দর, নির্গুণকে সগুণ এবং নিরাকারকে সাকারে পরিণত করে, প্রেমই মানুষের আমিত্বকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, তাহাকে "তুমিত্বে" লীন করে, আর ক্রমে ক্রমে মানুষকে সেই অখিল প্রেম-সিন্ধুর অগাধ অপরিমেয় প্রেমনীরে নিমজ্জিত করিয়া তোলে,—অক্ষয়কুমারের ভিতর আমরা ইহার সার্থকতা বেশ দেখিতে পাই। যিনি তাঁহার—

"সুখে দুখে ছিল সাথী
জগৎ জুড়ান জ্যোৎস্না রাতি—

* * *

কত শক্তি আপদে বিপদে

কত শোভা গৌরবে সম্পদে,"—

ছিলেন,—তাঁহারি প্রেম-তৃপ্ত অক্ষয়কুমার সদ্যোগত-প্রাণা পত্নীর জন্য ব্যাকুল হইয়া লিখিতেছেন—

"হও নাই গৃহের বাহির
আজ তুমি কোথা যাবে ? কার মুখ পানে চাবে
সুখে দুঃখে হইলে অস্থির ?
অচেনা অজানা ঠাঁই কেহ আপনার নাই
কে মুছাবে নয়নের নীর ?"

এ গেল পত্নীর জন্য স্বামীর সহানুভূতির করুণ উচ্ছ্বাস। এই খানেই বিভিন্ন শ্রেণীর ভাবাবেগে কবি-হৃদয়কে আলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিয়া তুলিতেছে—কখন কখন তাঁহার—

"বুঝিতে যে চাহে না হৃদয়।
বলিতে সোহাগে রাগে, মরিবে আমার আগে,
এ যেন তাহার অভিনয়!
এখনো যেতেছে দেখা, অধরে হাসির রেখা
মুখ যেন কথা কয় কয়!
আশে পাশে কোন্ খানে লুকায়ে রেখেছ প্রাণে!
অভিমান আর নয় নয়!"

কখন বা তিনি প্রিয়-পত্নীর প্রাণ ভিক্ষা করিয়া ভগবানের চরণে নিবেদন জানাইতেছেন—

"সহস্র প্রণাম করি, নিও না নিও না কাড়ি
একমাত্র সান্ত্বনা আশ্রয়।"

কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন তিনি নিজের প্রাণদানে প্রেয়সীর প্রাণদান করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেন,—

"চেষ্টা করি প্রাণেশ্বরী, নয় তবে দয়া করি
নিঃশ্বাস ফেলো গো একবার।
না পারো, আমার প্রাণ, আমি করিতেছি দান
শ্বাসে শ্বাসে অধরে তোমার।"

পত্নী শোকাহত কবি কখন বা ভাবিতেছেন—

"জন্মেছি ত একা,
না হয় কৈশোর শেষে তার সনে দেখা।"

* * * *

"সেই আদি সূত্র ধরি
আবার জীবন গড়ি,
সে যদি মুছিয়া যায় জীবনের মাঝ।"

কিন্তু তাহার পরেই নিজে তাহার কি সুন্দর উত্তর দিতেছেন—

"কি গড়িব আর?
আমি শুষ্ক ছিন্ন সূত্র দেব মালিকার!
কোথা হতে কি যে এলো,
গেল গেল, সব গেলো,—
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সর্ব্বস্ব আমার!"

একদিন ব্রজমাধবসঙ্গিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের উপর অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি আর কালো দেখিব না, কালো নাম আর কাণে শুনিব না,

কালো বসন আর অঙ্গে পরিব না, কালো যমুনার জলে আর অবগাহন করিব না। কিন্তু তাহার পরেই আবার তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা হইয়া, কালো তমাল বৃক্ষকে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। প্রেমের যে এই রীতি ও ধারা,—অক্ষয়কুমারের কথা ত ছার,—ইহার হস্ত হইতে একদিন সাক্ষাৎ প্রেম স্বরূপিনী শ্রীরাধাই অব্যাহতি পান নাই। তন্ময়তা ও একাগ্রতার সাধনায়, এই পার্থিব প্রেমই একদিন প্রেমিককে অপার্থিব প্রেমের রাজ্যে উপনীত করে,—তখন তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে বিয়োগ বা বিরহের যবনিকা অপসারিত হয়, সে আশে পাশে তাহার প্রেমাস্পদের ছবি দেখিতে পায়, কর্ণে তাহার কণ্ঠস্বর অহোরহ ধ্বনিত হইতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গে তাহার কোমলস্পর্শ অনুভূত হয়,—"এষা"র "উপহার" কবিতার প্রথম চরণের কয়েকটী পংক্তিতে এই তত্ত্বটী অক্ষয়-কুমারের ভাষায় সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে।

শ্রাদ্ধ বাসরে আবার তিনি পত্নীদর্শন কামনায় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন—

কি অদেয় তারে আজ! তেমনি হাসিয়া
সে কি লবে আর?
সমস্ত জগৎ দিলেন যদি তার দেখা মিলে!
সমস্ত জীবন যদি চাহে একবারে!

এ অধ্যায়টার মধ্যে অক্ষয়কুমারের পত্নী-দর্শন কামনা এবং
"সকল বন্ধন ছিঁড়ে একাকিনী কোথা ফিরে—
অনলে অনিলে, শূন্যে কোথায় কোথায়!"

—এই অন্বেষণ ওতপ্রোত ভাবে জড়ান রহিয়াছে। এখানে কবি নিজের সত্বাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন—পত্নীবিরহকাতর অক্ষয়কুমার সমস্ত জগৎ দিয়াও তাঁহার প্রিয়তমার দর্শনাকাঙ্খী।

একদিন তাঁহার গুরু ঠিক এমনই ভাবে পত্নীপ্রেম সম্পদাধিকারী হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোক্ গে এ বসুমতী, যার খুসী তার!"

ইহার পরে "শোক।" ইহার মধ্যেও সেই অন্বেষণ,—

কোথা তুমি প্রাণাধিকা! প্রতিধ্বনি ছুটে,
কি তুমুল কোলাহল, শূন্য শতথান··

কিন্তু এইখান হইতেই তাঁহার অকপট পত্নীপ্রেম তাঁহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, এইখান হইতেই তাঁহাকে বুঝাইতেছে—

"মরেছে তাহার দেহ
মরেনি ত প্রেম স্নেহ
রেখে যেন গেছে সমুদয়।
সেই ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ আশা তৃষা ভয়।"

এইখানেই কবি প্রেমের অবিনশ্বরত্ব বুঝিলেন, বুঝিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদার কার্য্যভারগুলি একে একে "সুনিপুণ" ভাবে তুলিয়া লইতেছেন—

"তারি হৃদি হৃদে ধরি।
তারি গৃহ কার্য্য করি;
প্রতি কার্য্যে স্মরি অনুক্ষণ
মরমে মরমে কাঁদি মুছি দুনয়ন।"

"সান্ত্বনা"র ভিতর কবির পত্নীপ্রেম গণ্ডি ছাড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাঁহাকে বিশ্ব ও বিশ্বপতির প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে,—

এইখানেই তিনি প্রেমের সর্ব্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়া অটল বিশ্বাসের সহিত গাহিয়াছেন,—

ত্যজিয়াছ মর্ত্ত্যভূমি
তবু আছ,—আছ তুমি।
তুমি নাই, কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস।
এত রূপ গুণভক্তি
এত প্রীতি অনুরক্তি
সৃজনে যে পূর্ণতার নাহিক বিনাশ।"

ইহাই তাঁহার পত্নীপ্রেমের পূর্ণপরিণতি—

—এই "তবু আছ—আছ তুমি" অতি সত্য, অতি ধ্রুব। ইহাই ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়।

এইবার শোক ও সান্ত্বনার কথা। দেখা যাউক কবি কি ভাবে, কোন পথ দিয়া, শোকের রাজ্য হইতে সান্ত্বনার চিরস্থির অমরাবতীতে পৌঁছিয়াছেন। 'শোকে'র প্রথম আঘাতে তিনি বলিতেছেন,—

"শূন্য সব শূন্যময়
নিষ্ঠুরতা জগৎ জুড়িয়া!"

তাঁহার মনে হইতেছে—

"অশ্রুরোধ শ্বাসরোধ, অসহ্য জীবন বোধ
ইচ্ছা হয় মরি আছাড়িয়া।"

কখন বা—

"প্রতি-পল-পরিচিতা! তোমারে বিচ্ছিন্ন করি—
কেমনে এ শূন্য মনে, এ শূন্য জীবন ধরি।"

কখন তিনি জীবনকে "মরণেরি নামান্তর" মনে করিয়া মরিয়া জুড়াইতে চাহিতেছেন, কিন্তু তাহার মরিতে সাহস নাই, কেন না—

"শিথিল শরীর মন বিচ্ছিন্ন ভাবনা"

শোকের প্রচণ্ড উন্মত্ততা কবিকে একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। জীবনের উদ্দেশ্যে তিনি সন্দিহান হইতেছেন—ঈশ্বরের উপরও তিনি অভিমান করিতেছেন—

"কোন অপরাধে এই কঠোর শাসন ?
কোন্ পিতা পুত্র প্রতি
এমন নির্দ্দয় অতি ?
আমিও ত করিতেছি সন্তান পালন
কত রাগি চোখে মুখে,
তখনি ত টানি বুকে,
মুছাতে নয়ন তার—মুছি ত আপন।"

কিন্তু এই অভিমান হইতেই সর্ব্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের চিরমঙ্গলময়ত্বে তাঁহার বিশ্বাস আসিবে। পরে তাহা দেখাইতেছি, এখন এ ঘোর, কতদূরব্যাপী হইয়াছে তাহা দেখানো প্রয়োজন। এই অবস্থায় নাস্তিকতার ছায়া আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছে—তিনি দেখিতেছেন ধরা, জড় পরমাণু মাত্র; জীবন সেই বজ্রদগ্ধ স্থাণু, আর সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধাতার এই সৃষ্টি, এও এক মহা দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার। তাহার যেন নিজশক্তির সীমাজ্ঞান নাই, সকল প্রকার অনুভবক্ষমতা ও অনুরক্তি হারাইয়া তিনি

"উন্মত্ত কবির মত
গড়ে ভাঙ্গে অবিরত
লয়ে এক অন্ধশক্তি—কল্পনা ভীষণ।"

এই নাস্তিকতার ভাব তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইলেও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই, হইতে পারে নাই, কারণ সেখানে তাঁহার প্রেমভক্তিময়ী পত্নীর অম্লান প্রেম হিরণ্ময় জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে—এই নাস্তিকতার ভাবকে বিদূরিত করিয়া অল্পে অল্পে তাঁহাকে আস্তিক বা ঈশ্বরবিশ্বাসী করিয়া তুলিতে লাগিল।

ক্রমে তাঁহার মনে হইল-

"মৃত্যু, প্রতিদিবস ঘটনা,
তাহে কেন এত শোক
সবই মরিবে, সবারি মরেছে
চিরজীবি কোন্ লোক ?

কবি বলিতেছেন—সত্যই ত, ঘরে ঘরে মৃত্যু, ঘরে ঘরে শোক হাহাকার, এত শুধু আমার একা নয়—সকলেই সয়, আমিও সকলের মত সহ্য করিব।

আবার সুর ফিরাইয়া তিনি বলিতেছেন—

"দেব-দয়া নাহি চাহি আর!
ইচ্ছা হয়,—দৈত্য সম লয়ে নিজে তম ভ্রম,
মৃত্যুরে আক্রমি একবার—
গ্রহ উপগ্রহ টানি, প্রিয়ারে ফিরায়ে আনি!
দেখি মৃত্যু কি করে আমার।"

—'নরনারী স্বার্থভরা এবং জগৎ নরক বিশেষ, ইহার মধ্যে মৃত্যুই একা সর্ব্বেশ্বর মাত্র।'

ইহার পরেই তিনি "আত্ম জিজ্ঞাসায়" মনোনিবেশ করিলেন—

"কেন বুদ্ধ ত্যজিল আবাস
কেন নিল নিমাই সন্ন্যাস—
মৃত্যু যদি শেষ ?"

কেনই বা ক্রমে আমি মূঢ়ের মতন শোকে আত্মহারা হইয়া সনাতন বিশ্বাস হারাইতেছি। এই দেহ সত্য, প্রাণও সত্য, এই যে সুখ দুঃখজ্ঞান ইহাও অতীব সত্য। যতদিন কর্ম্মভোগ ছিল, তত দিন সে রোগ শোক ভোগ করিয়া এই জগতে ছিল। আমিও কর্ম্মশেষে তাহার মতন হাসিয়া পলাইব।

এইখানেই তাঁহার মন বিশ্বাসের দিকে নিয়মিত হইতেছে—এইখান হইতেই বিশ্বাসের আলোকচ্ছটা তাঁহার হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিতেছে,—

"সে আমার নিশ্চয় কোথায়
বসিয়া আমার অপেক্ষায়
গভীর বিশ্বাসে।"

তাই এই বাণী কবির কণ্ঠে উত্থিত হইয়াছে। তাঁহার অন্তর্নিহিত পত্নীপ্রেম অল্পে অল্পে তাঁহার চক্ষে প্রেমাঞ্জন মাখাইয়া দিল—তাহার সাহায্যে তিনি দেখিলেন—মরণ সে ত সৃষ্টির বাহিরে। সৃষ্টির ভিতর ত বিনাশ নাই, বৃষ্টি ঝরিতেছে, কিন্তু তাহাই ত আবার বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া নব মেঘের সঞ্চার করিতেছে। সতীর দেহত্যাগে পার্ব্বতীর জন্ম,—একি মৃত্যু? এ ত মাত্র দেহ বা আকার পরিবর্ত্তন। প্রকৃতির রাজ্যে কিছুরই বিনাশ নাই, কারণ, প্রকৃতি যে জননী। এই প্রকৃতি-জননীর স্তন্য সুধা পান করিয়া তিনি নবপ্রাণ পাইলেন, তাঁহার নয়নে ধরণী অনন্ত শোভাসম্পদময়ীরূপে প্রতিফলিত হইল। এইবার তিনি এই জটিল মৃত্যু সমস্যার সমাধান করিয়া গাহিয়াছেন—

"কোথা-তুমি বিশ্বস্বামী!
কোথা—ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি!
কত তুচ্ছ সুখ দুঃখ, জীবন-মরণ!"

তাই তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন "মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি।" মরণ—প্রশস্তি গাহিয়া কবি অমর হইলেন—

"হে মরণ, ধন্য তুমি! না বুঝে তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে
জগতে তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেম দেব-মহিমায়।
আজি মোর প্রিয়তমা
তব করে বিশ্বরমা
ভাসিছে ইন্দিরা সমা সৃষ্টি নিলীমায়!"

ইহার পরেই তিনি মঙ্গলময় ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন জানাইয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। এইখানে তিনি সার সত্যে উপনীত হইয়াছেন—তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী যে ভগবানেরই ছায়া এবং তাঁহার প্রেমের মায়া, তাহা তাঁহার সম্যক্ উপলব্ধি হইল। এইবার তিনি বেশ বুঝিলেন যে, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া সেই অনাদি অনন্ত ও অসিমের বিচার করিতে বসি—আপন আপন সুখ দুঃখ দিয়া সেই বিরাট পুরুষের ভালমন্দ যাচাই করি, এই আত্মাভিমান আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, আর ইহাই তাঁহার মত আপনার জনকে দূরে রাখিয়া দেয়। তাই শোক-শান্ত প্রেমিক কবি তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিলেন—

"দাও প্রেম—আরও প্রেম, চির প্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি
আরো আত্মজয় শক্তি—
তোমারি ইচ্ছায় কর, মোর ইচ্ছা লয়।"

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

শ্রেয়া

Whoe'er you be send blessings to her—she
Was sister of my soul immortal, free!
My pride, my hope, my shelter, my resource,
When green hoped not to grey to run its course;
She was enthroned Virtue under heaven's dome
My idol in the shrine of curtained home.

VICTOR HUGO

উপহার

আবার—আবার—
ল'য়ে সেই দিব্য দেহ,
সে অতৃপ্ত প্রেম-স্নেহ,
আসিছ—ভাসিছ কেন সম্মুখে আমার।
হাসি-হাসি মুখখানি,
সরমে সরে না বাণী,
আঁচলে নয়ন, রাণী, মুছি' বার বার।

কত যুগ-যুগ পরে—
এখনো কি মনে পড়ে
তোমার সে হাতে গড়া সোনার সংসার।
কবিত্ব-কল্পনা-ভরা,
জীবন-মরণ-হরা,
ত্রিভুবন-আলো-করা প্রীতি দু'জনার।

বৈতরণী-তীরে বসি'
মরণের তরে শ্বসি—
আশা-তৃষ্ণা-হীন বৃদ্ধ—রুদ্ধ-অশ্রুধারা ;
তুমি কেন, পৌর্ণমাসী,
আবার উদিছ আসি'
দুঃখ-শিরে-শিরে করি' কৌমুদী-বিস্তার ?

প্রেমের কুহক-মন্ত্রে
কি বাজাবে ভাঙ্গা যন্ত্রে ?
বুঝি না এ ছিন্ন তন্ত্রে কি বাজিবে আর !
আছি কি জীবন নিয়ে—
তুমি বুঝিবে না, প্রিয়ে,
আপনি জানি না হায় কথা আপনার !

কেন আঁখি ছল-ছল ?
স্বর্গ-মর্ত্ত্য—রসাতল !
বাহিছে হৃদয়-ক্ষতে নব রক্তধার !
আবার সে প্রেমোচ্ছ্বাসে
শত প্রাণ ছুটে আসে !
ছিন্ন হয় শত গ্রন্থি মিথ্যা-সান্ত্বনার !

এস।

তব বরাভয় করে
ধর কর চিরতরে।
চল—চল নিজ গৃহে,—দূর-মেঘপার।
প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে,
কোথা তুমি—কোন্ দিকে।
জীবনে—মরণে আমি তোমার—তোমার।

নিবেদন

কোথা পাব বাল্মীকির সে উদাত্ত স্বর ?
  কোথা কালিদাস-কণ্ঠ ষড়জ-মধুর ?
কোথা ভবভূতি-ভাষ—গৈরিক-নির্ঝর ?
  ছিন্ন-কণ্ঠ পিক আমি, মরণ-আতুর।

সে নহে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, সতী,—
  চিরোজ্জ্বল দেবী-মূর্ত্তি কবিহৃদ-মন্দিরে ;
ল'য়ে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ মমতা ভকতি,
  ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র-কুটীরে।

নহে কল্পনার লীলা—স্বরগ নরক ;
  বাস্তব জগৎ এই, মর্ম্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য রসাত্মক ;
  মানবীর তরে কাঁদি—যাচি না দেবতা।

স্বপ্ন

কৃষ্ণপক্ষ, চতুর্থী, শনিবার, দিবা আ॰ ঘটিকা,

১৯শে মাঘ, ১৩১৩ সাল

"বাবা,

মা—কেন এত কর জপে আজ,
কবে এত ঠাকুর-প্রণাম ?"
কাছে যা, বাছা রে, শুনা গে তাহারে
জল্মেনর মত হরি-নাম।

"বড ভয় করে, তুমি এস ঘরে,
এলো-মেলো কি বকে কেবল !"
গঙ্গা-মৃত্তিকায় লেপে দাও গায়,
দাও গিয়া মুখে গঙ্গাজল।

"চোখ বড় রাঙ্গা, গলা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা,
দিদিমা ঠাকুমা বড় কাঁদে !"
কর গে বারণ, ঘুমাবে এখন ;
বাঁধিও না আর মায়া-ফাঁদে ।

"তবে মা আমার—" ইচ্ছা বিধাতার !
এখনো ত রয়েছে জীবন ।
যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ ;
ভক্তিভরে ডাক নারায়ণ ।

"ডাকি বার বার—" কাঁদিও না আর,
যাও, তার পদধূলি লও ।
বাছা, প্রাণ ভরি' আশীর্ব্বাদ করি,—
তারি মত সতীলক্ষ্মী হও ।

পত্রবাহী ডাকে,—"চিঠি আছে।"
দেখি পত্র খুলি',—
কর্ম্মস্থল হ'তে আসিয়াছে
শুষ্ক তিক্ত বুলি।

"অমরের চিঠি?—ভাল আছে?"
মুমূর্ষু জিজ্ঞাসে।
(সংবাদ দেই নি পুত্র কাছে—
কি ভুল হতাশে!)

অশ্রুভরা কাতর নয়ন
এক-দৃষ্টে চায়,
নাহি শ্বাস, হৃদয়ে কম্পন,
উত্তর-আশায়।

হে দেবতা, লই তব নাম,
এই মিথ্যা শেষ,—
'ভাল আছে, করেছে প্রণাম,
পড়িতেছে বেশ।'

বক্ষঃ হ'তে নেমে' গেল ভার—
গভীর নিঃশ্বাস,
ম্লান মুখে ফুটিল আবার
ধীর স্থির হাস।

শান্ত—তৃপ্ত, কৃতজ্ঞতা-নীরে
উজ্জ্বল নয়ন,
শান্ত—তৃপ্ত, ধীরে পার্শ্ব ফিরে'
করিল শয়ন—
কঙ্কাল জীবন।

৬

এই কি মরণ ?

এত দ্রুত সহসা এমন !

চিরতরে ছাড়া-ছাড়ি, দেহে প্রাণে কাড়া-কাড়ি,
নাই তার কোন আয়োজন।
বলিবে না কোন কথা, জানাবে না কোন ব্যথা,
ফিরাবে না বারেক নয়ন।
মন কি গো কাঁদিছে না ? প্রাণে কি গো বাধিছে না,
যেতেছ যে জন্মের মতন।

হও নাই গৃহের বাহির
আজ তুমি কোথা যাবে ? কার মুখ-পানে চাবে
সুখে দুঃখে হইলে অস্থির ?
অচেনা অজানা ঠাঁই, কেহ আপনার নাই—
কে মুছাবে নয়নের নীর ?
কোমলা সরলা অতি, পতি গতি, পতি মতি,
কে বুঝিবে মর্য্যাদা সতীর।

এ কি দেখি জাগিয়া স্বপন ?
দুই যুগ জানা-জানি—আজ কিসে মিথ্যা মানি—
দুই দেহে এক প্রাণ-মন।
এত আশা, হাসা-কাঁদা, এত বুকে বুকে বাঁধা
এত ভক্তি, মমতা, যতন—
ভাবি নাই একবারো তুমি যে মরিতে পারো,
পারো যে গো ভুলিতে এমন।

বুঝিতে সে চাহে না হৃদয়।
বলিতে সোহাগে রাগে, —মরিবে আমার আগে,
এ যেন তাহারি অভিনয়।
এখনো যেতেছে দেখা অধরে হাসির রেখা,
মুখ যেন কথা কয়-কয়।
আসে-পাশে কোন্‌-খানে লুকায়ে রেখেছ প্রাণে।
অভিমান আর নয়—নয়।

না না কাঁদিও না প্রাণ।
শ্বাস ওই পড়িল না ? দেহ ওই নড়িল না ?
খুলে' দাও জানালা দুয়ার।

দেখ—দেখ এই কর যেন কিছু উষ্ণতর,
দাও তাহা সর্ব্বাঙ্গে আবার !
দাও, মা, চরণ-ধূলি, আশিস' হৃদয় খুলি',
সত্য হোক্ আশিস্ তোমার !

('বাঁচাও—বাঁচাও, দয়াময় !
ভিক্ষা মাগি যুড়ি' হাত, করিও না বজ্রাঘাত,
জ্বলে' পুড়ে' যায় সমুদয় !
সহস্র প্রণাম করি, নিও না—নিও না হরি'
একমাত্র সান্ত্বনা-আশ্রয় !
ধরণীর এক কোণে লইয়া আপন-জনে
আছি সুখে—সন্তুষ্ট-হৃদয় ।)

মেল আঁখি, সর্ব্বস্ব আমার !
ম'রো না—ম'রো না, প্রিয়ে, একমাত্র তোমা নিয়ে
আমার এ সাজান সংসার ।
চেষ্টা করি', প্রাণেশ্বরী, নয়—তবে দয়া করি'
নিঃশ্বাস ফেল গো একবার !
না পারো, আমার প্রাণ আমি করিতেছি দান—
শ্বাসে—শ্বাসে অধরে তোমার ।)

নিও না গো—নিও না কাড়িয়া !
একা—একা, অতি একা ! এই দেখা—শেষ দেখা !
যায়—যায় হৃদয় পুড়িয়া !
কোথা হ'তে কি যে হয় ! শূন্য—সব শূন্যময় !
নিষ্ঠুরতা জগৎ জুড়িয়া !
অশ্রুরোধ—শ্বাসরোধ, অসহ্য জীবন-বোধ !
ইচ্ছা হয়,—মরি আছাড়িয়া ।

৪

মরণে কি মরে প্রেম ? অনলে কি পুড়ে প্রাণ ?
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্ম-দান ?
জীবন-জড়ান সত্য—সকলি কি মিথ্যা আজ ?
গৃহ ছাড়ি' গৃহ-লক্ষ্মী শুইয়া শ্মশান-মাঝ !

সহসা নিদ্রার মাঝে এ কি জাগরণ মম !
এই ছিলে—আর নাই, চলে' গেছ স্বপ্ন সম !
প্রতিপল-পরিচিতা ! তোমারে বিচ্ছিন্ন করি'
কেমনে এ শূন্য-মনে এ শূন্য-জীবন ধরি !

কি ছিলে আমার তুমি,—প্রেয়সী না ক্রীতদাসী ?
দুটী হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি !
একান্ত-আশ্রিত-প্রাণা—নাই নিজ সুখ দুখ,
সব আশা—সব সাধ আমাতেই জাগরূক !

জাগে শোকে অভিমান,—কেন এত ভালবেসে
আভাসে বল নি তুমি, এত দুখ দিবে শেষে !
তুমি অভিশপ্তা দেবী—কেন বল নাই আগে,—
সুধু স্বরগের ছায়া দেখাইছ অনুরাগে ?

একে একে প্রতি দিন, প্রতি কথা মনে পড়ে,
আবার যে হয় ভ্রম,—তুমি বসে' আছ ঘরে !
পরিজন-মুখপানে কাতর-নয়নে চাই,
আকুলিয়া উঠে প্রাণ, নাই তুমি, নাই—নাই !

আকাশের পানে চাই,—কোন দেব আসি' যদি
দেন মৃত-সঞ্জীবনী, দেন কোন মন্ত্রৌষধি !
কি আদরে বুকে করে' ঘরে ফিরে' ল'য়ে যাই !
আকুলিয়া উঠে প্রাণ, সে তপস্যা নাই—নাই !

ধূধূ ধূধূ জলে চিতা, উঠে শূন্যে ধূমভার !
চেয়ে আছি—চেয়ে আছি—সুধু মোহ, কে কাহার !
অশ্রুহীন দগ্ধ আঁখি আসে যেন বাহিরিয়া,
বুকে ঘুরে দীর্ঘশ্বাস সমস্ত হৃদয় নিয়া।

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, হৃদয়ে পড়িছে ছেদ,—
পশ্চাতে আলোক-ছায়া, স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবিভেদ !
সম্মুখে উঠিছে জাগি' কি কঠোর দীর্ঘ দিন !
ভ্রমিতেছি শোক-বৃদ্ধ দীন হীন উদাসীন।

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, নিবিতেছে চিতানল ;
জলদ করুণ-প্রাণ ঢালিতেছে শান্তিজল।
বিধবা বিস্ময়-দৃষ্টি, সধবা প্রণাম করে ;
শ্বসিয়া—শ্বসিয়া বায়ু কাঁদিতেছে বনান্তরে।

বিদায়—বিদায় তবে ! দিবা হ'ল অবসান ;
জানি না মৃত্যুর পরে বিধাতার কি বিধান !
যেথা থাক—সুখে থাক ! ঝরে তপ্ত অশ্রুভার ;
অদূরে জাহ্নবী বহে, ধরা অতি অন্ধকার।

৫

ডুবিয়া—ডুবিয়া জলে জ্বালা না জুড়ায়।
নহে দূর—নহে দূর,
ওই মরণের পুর!
আর এক পদক্ষেপে সকলি ফুরায়।

উথলি' উছলি' দুলি' চলে জলরাশ;
হৃদয়-শ্মশান খুলে'
ধরণী পড়িয়া কূলে;
নিকটে এসেছে নেমে' বিষণ্ণ আকাশ।

নাহি তারা, নাহি তরী, জলদ ঘনায়;
ঘুরে ঢেউ আসে-পাশে,
কত কল-কল ভাষে,
ঝাঁপায়ে পড়িয়া বুকে তলাইতে চায়।

হৃদয় উদাস অতি, নয়ন উদাস।
সম্মুখে গভীর বারি
ডাকে দীর্ঘ-বাহু নাড়ি'!
মনে পড়ে দূর গৃহ—পড়ে দীর্ঘশ্বাস।

এই ত জগতে সুখ, এই ত জীবন!
সহে না নিমেষ-ভর,
মরণেরি নামান্তর!
দেখি না—দেখি না তবে মরণ কেমন!

নাহি আশা, নাহি তৃষা, জীবন যন্ত্রণা;
মরিয়া জুড়াতে চাই,
মরিতে সাহস নাই।
শিথিল শরীর মন, বিছিন্ন ভাবনা।

৬

গৃহতলে আছে বসি' পুত্রকন্যাগণ
করিয়া মণ্ডল ;
নরবস্ত্র-পরিহিত, বাক্যহীন, সঙ্কুচিত,
ম্লান মুখ, রুক্ষ কেশ, নেত্র ছল-ছল্ ।

মধ্যে বসি' ক্ষুদ্র শিশু, কিছু নাহি বোঝে—
কেন যে এমন !
দেখে বস্ত্র আপনার, দেখে মুখ সবাকার,
দেখে দ্বার-পানে চাহি'—কাতর-নয়ন ।

প্রাঙ্গণে ধূলায় পড়ি' কাঁদিছেন মাতা
গুমরি' গুমরি' ;
সোদরা বুঝাতে যায়, সেও কাঁদে উভরায় ;
অদূরে কাঁদিছে দাসী হাহাকার করি' ।

এ ঘরে ও ঘরে ঘুরে' কাঁদে বিড়ালীটী,
কি দীন ক্রন্দন !
অতি বিশৃঙ্খল ঘর, বহে গেছে মহাঝড়,
আসে যায় প্রতিবেশী নিঃশব্দ-চরণ।

জ্বলে দীপ ক্ষীণপ্রভ, ম্রিয়মাণ শিখা
কাঁপে ঘন ঘন ;
প্রাচীরে পড়িছে ছায়া,—যেন তার স্নেহ-মায়া
এখনো ঘুরিছে ঘরে—এখনো- -এখনো !

রয়েছি জানালা দিয়া শূন্যপানে চাহি'—
অতি শূন্য মন।
স্তব্ধ ক্ষুব্ধ অন্ধ তমঃ—ভীষণ দৈত্যের সম
ঘুমায়— ছড়ায়ে দেহ—ভরিয়া গগন।

এই কি জীবন ?
এত শ্রম—এত ভ্রম—এত সংঘর্ষণ !
কত-না কামনা করি'
আকাশ-কুসুম গড়ি !
কত গর্ব্ব-অহঙ্কার, কত আস্ফালন !
ধরা যেন পায়ে ঘুরে,
পড়ে' থাকি বিশ্ব জুড়ে',
আপন মহিম্ন-স্তবে আপনি মগন।

তার পর, এ কি আজ !—নির্ম্মেঘ গগন,
মধ্যাহ্ন মধুর অতি,
সমীরণ ধীর-গতি,
রচিতেছি নিজ মনে দিবস-স্বপন—
সহসা কি ভয়ঙ্কর
শত বজ্র কড়-কড় !
প্রিয়জনে আগুলিতে কত প্রাণপণ !

নিমেষে নন্দন-বন শ্মশান ভীষণ !
বিশ্বাসিতে হয় ভয়,
তবু বিশ্বাসিতে হয় !
আঁখি হ'তে গেছে মুছে' কুহক-অঞ্জন।
সুখ-স্বপ্ন গেছে টুটে',
হৃদয় ধূলায় লুটে,
মুখে নাহি কথা সরে—ঝরে না নয়ন।

অহো, কি মানব-ভাগ্য—কি পরিবর্ত্তন !
ধরা—জড় পরমাণু,
প্রাণ—বজ্র-দগ্ধ স্থাণু,
বহি এক কি দুর্ব্বহ নিরাশ্রয় মন।
মরিতে পারিলে বাঁচি,
শ্বাসে শ্বাসে মৃত্যু যাচি,
দূরে—দূরে সরে যায়, নির্দ্দয় মরণ !

কাহার সৃজন এই নগণ্য জীবন ?
এ কি শুধু প্রহেলিকা ?
ওই আলেয়ার শিখা
জ্বলিতে—জ্বলিতে গেল নিবিয়া যেমন !

বাঁধিতে বাঁধিতে স্থর
সপ্তস্বরা শত-চূর !
মেলিতে—মেলিতে আঁখি মিলাল স্বপন !

এই প্রাণ !—এর লাগি' কত-না যতন !
কামে ক্রোধে সদা অন্ধ,
লোভে মোহে কত দ্বন্দ্ব,
কত-না মাৎসর্য্য-মদে জগত-মর্দ্দণ !
কত আধি ব্যাধি সহি,
কত দুখ ক্লেশ বহি,
সুখ-ভ্রমে করি কত অভাব-সৃজন ।

এই কি এ জগতের শুভ বিবর্ত্তন ?
এই হাড়ে হাড়ে শোক
দেখাবে কি পুণ্যালোক ?
ভূমিকম্প—ঘূর্ণবাত্যা কি করে সাধন ?
স্বর্ণ-মন্দিরের চূড়া
বজ্রাঘাতে করি' গুঁড়া,
পাতিব অঙ্গারে ভস্মে কোন্ দেবাসন ?

কোন্ অপরাধে এই কুঠোর শাসন ?
কোন্ পিতা পুত্র প্রতি
এমন নির্দ্দয় অতি ?
আমিও ত করিতেছি সন্তান পালন—
কত রাগি চোখে মুখে,
তখনি ত টানি বুকে,
মুছাতে নয়ন তার—মুছি ত আপন !

এ নহে দেবের দয়া—দৈত্যের পীড়ন।
গিয়াছে প্রাণের সার,
মর্ম্মে মর্ম্মে হাহাকার,
নিরাশার অন্ধকার ঘেরিয়া ভুবন !
মরণের পথে আজ—
দূরে ফেলি' ঘৃণা লাজ,
কে দেবতা তার স্থান করিবে পূরণ ?

কই শোকে সমাশ্বাস—স্নেহ-নিদর্শন ?
কত শোভা বুকে ধরি'
অকালে সে গেল মরি'—
কে দেবতা স্মরি'—স্মরি' করিল রোদন ?

বৃথা আসি' বৃথা যাই,
কিছুই উদ্দেশ্য নাই ;
ঊর্ম্মি সম মৃত্যু-সিন্ধু করি সম্পূরণ !

এ যে অদৃষ্টের শুধু নির্ম্মম পেষণ !
যায় দিন—পায় পায়,
সুখ যায়, দুঃখ যায় ;
কত আসে, কত যায়—কে করে গণন ।
যায় দিন—যায় আশা,
যায় প্রীতি, ভালবাসা,
ভাবনা, ধারণা, স্মৃতি, কল্পনা, স্বপন ।

যায় দিন—যায় জীব, নিস্তার গগন ;
শতধা-বিদীর্ণ ভানু,
শ্লথ অণু-পরমাণু ;
লুপ্ত শশী, লুপ্ত ধরা—উদ্দীপ্ত-মরণ ?
বিধাতা নিষ্কম্প-দৃষ্টি,
হেরিছে—তাহার সৃষ্টি
মরণের স্তরে স্তরে করে আরোহণ !

হৃদি-হীন বিধির কি দুর্ব্বোধ সৃজন !
নাহি বুঝে নিজ শক্তি,
নাহি লক্ষ্য আনুরক্তি,
নাহি অনুভব-তৃপ্তি—সূক্ষ্ম দরশন ।
উন্মত্ত কবির মত,
গড়ে ভাঙ্গে অবিরত
ল'য়ে এক অন্ধ শক্তি—কল্পনা ভীষণ !

অশৌচ

এই কি প্রভাত !
এত ক্ষণে পোহাল কি শোক-দীর্ঘ রাত ?
ওই সেই উষালোকে—
সেই ধরা জাগে চোখে ।
সত্য-ই জীবিত আমি দেহ-মনঃ সাথ !

রবি নিরুজ্জ্বল
আকাশের এক প্রান্তে করে টল্‌-টল্‌ !
সমস্ত আকাশ ভরি'
ছিন্ন ভিন্ন মেঘ পড়ি'—
নিশীথে চযেছে শূন্য যেন দৈত্যদল !

ছিন্ন ভিন্ন সব !
মূক পশু পক্ষী প্রাণী, জগৎ নীরব।
বায়ু বহে কি না বহে ;
মানুষে কতই সহে !
কি শূন্য-জীবন আজ করি অনুভব !

জন্মেছি ত একা !
না হয় কৈশোর-শেষে তার সনে দেখা !
তার মিলনের আগে,
কিছুতে না মনে জাগে
কেমনে কাটিত দিন—কি অদৃষ্ট-লেখা !

কে বলিবে আজ—
কি ছিল কৈশোর-আশা, কৈশোরের কাজ !
সেই আদি সূত্র ধরি'
আবার জীবন গড়ি—
সে যদি মুছিয়া যায় জীবনের মাঝ !

কি গড়িব আর ?
আমি শুষ্ক ছিন্ন সূত্র—দেব-মালিকার !
কোথা হ'তে কি যে এলো,
গেল—গেল, সব গেলো—
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ—সর্ব্বস্ব আমার !

গেছে—যাক্‌, যাক্‌—
বলিতে পারি না আর শোক-গর্ব্ব-বাক্‌ !
হৃদয় পুড়িয়া ছাই,
নাই, আর কিছু নাই !
ধূলায় মিশিয়া যাই,
দু' পায়ে দলিয়া যাক্‌ শত দুর্ব্বিপাক ।

মৃত্যু !—প্রতি— দিবস ঘটনা ;
তাহে কেন এত শোক ?
সবাই মরিবে, সবারি মরেছে,
চির-জীবী কোন্ লোক ?

পিতা ভাবে,—কবে অবসর ল'বে,
পুত্র তার হ'লো কৃতী ;
কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুরে আজো বৃদ্ধ পিতা
ল'য়ে শোক-দীর্ণ স্মৃতি ।

স্থবিরা জননী, একই বাছনী,
পূজা না হইতে শেষ,—
পথে পথে ওই ছুটে পুত্রহারা,
আলু-থালু রুক্ষ কেশ ।

বিধবা ভগিনী পথ চেয়ে র'বে,
বুঝিবে না কোন মতে—
মাতৃপিতৃ-হীন ক্ষুদ্র ভ্রাতা তার
সেই যে গিয়াছে পথে !

দেশে আসে পতি, নবীনা যুবতী—
বুকে না আনন্দ ধরে ;
কূলে ডুবে তরী, ধরা-ধরি করি'
বিধবায় আনে ঘরে।

বিব্রত জনক, মাতৃহীন শিশু
কিছুতে নাহি যে ভোলে—
পথে পথে যাবে, ঘোমটা দেখিবে—
কাঁদিবে 'মা—মা' বলে'।

ঘরে ঘরে মৃত্যু—শোক-হাহাকার,
আমার একেলা নয় ;
সবাই সহিছে, আমিও সহিব,
সময়ে সকলি সয়।

কারা ছিল কাল ? কে আমরা আজ ?
পরশ্বঃ আসিবে কারা ?
হাসিয়া কাঁদিয়া অন্ধ মৃত্যু-মুখে
ছুটিছে জীবন-ধারা।

কোথায় মিলায় ? কে জানে কোথায় !
কোথায়—কোথায়, প্রিয়া !
আকুলিয়া বায়ু চিতাভস্ম তার
দেয় দেহে মাখাইয়া।

কোথায়—কোথায় ? আসে প্রতিধ্বনি—
আবার শ্মশান-যাত্রী !
মেঘে মেঘে মেঘে দিবস ফুরাল,
সম্মুখে আঁধার রাত্রি।

৩

(গৃহ নিরানন্দ অন্ধকার।
আমি কি এ গৃহ-স্বামী?
চোরের মতন আমি
ভয়ে ভয়ে হেরি চারিধার!

সারাদিন ঘুরি পথে পথে,
মিলি জন-কোলাহলে;
হৃদয় বাঁধিয়া বলে,
বিশ্বাস করিয়া কোন মতে—

ফিরিয়াছি গৃহে আপনার।
আঁখি মেলি' দেখিবারে
সাহসে কুলায় না রে—
পাছে ভুল ভাঙ্গে পুনর্ব্বার!)

নিঃশব্দে দাঁড়ায়ে আছি দ্বারে ;
জগৎ আঁধার স্তব্ধ,
হৃদয়ে দারুণ শব্দ—
ভুলিতে পারি না আপনারে !

আবার আশায় করি ভর ;
ঘরে বা তুলসী-তলে
যদি তার দীপ জ্বলে—
যদি তার শুনি কণ্ঠ-স্বর—

ঘুচে' যায় এ চিত্ত-বিকার !
বলি তারে,—'আয়ুষ্মতী,
দেখেছি দুঃস্বপ্ন অতি,
কি যে কষ্ট—নহে বলিবার !

'পা দিও না আর মৃত্তিকায় !
মিলন-কাতরা ধরা
রোগ-শোক-মৃত্যু-ভরা,
বিরহ ফিরিছে পায় পায় ।

'এস, বুকে রাখি লুকাইয়া—
কঠিন ঐ অস্থি-চর্ম্ম,
গভীর হৃদয়-মর্ম্ম,
দীর্ঘ—এই দীর্ঘ—প্রাণ দিয়া !

'তার পর, যা হয় তা হোক্ ।
মরণে মরণে যোগ—
একত্রে স্বরগ-ভোগ,
না হয় একত্র প্রেতলোক !'

হে বিগ্রহ, পাষাণ-হৃদয় !
এই কি তোমার সৃষ্টি ?   তুমি সেই স্থির-দৃষ্টি !
তুমি ত আমার কেহ নয় ।
কি দেখিছ স্বর্ণচক্ষে ?   প্রলয় ছুটেছে বক্ষে !
নর-ভাগ্যে, অহো, কত সয় !

কি মাগিব ? কি দিবে আমায় ?
ধূপে পুষ্পে দীপালোকে,   স্তব-স্তুতি-মন্ত্র-শ্লোকে
মুগ্ধ তুমি নিজ মহিমায় ;
ষড়ৈশ্বর্য্য ষড়ভুজে—কাতর-নয়ন খুঁজে
স্বপ্নময়ী হারাল কোথায় !

বুঝিবে না, বধির দেবতা !
চিরদিন লক্ষ্মী সনে বিরাজিছ সিংহাসনে,
ভাবিতেছ বিশ্বের বারতা !
কাংস্য-ঘণ্টা-শঙ্খ-রোলে—তবু না শ্রবণ খোলে,
পশে না নরের ক্ষুদ্র কথা।

কিছু নাই আমার প্রার্থনা।
সে অতি-প্রত্যুষে উঠি,' আসিত হেথায় ছুটি,'
করিত এ মন্দির-মার্জ্জনা ;
তুলি' ফুল, গাঁথি' মালা, সাজাত নৈবেদ্য-ডালা,
সচন্দন তুলসী, অর্চ্চনা।

জানু পাতি'—কৌষেয়-বসনা,
স্থির-নেত্রে, যুক্ত-করে, ঝর-ঝর অশ্রু ঝরে,
তোমা-পানে চাহি' একমনা !
পড়ে-কি-না-পড়ে শ্বাস, সিক্ত মুক্ত কেশ-রাশ,
শিথিল-অঞ্চলা, স্মিতাননা।

আবার সন্ধ্যায় হেথা আসি'
দীপ দিয়া, ধূপ দিয়া, প্রণমিয়া—প্রণমিয়া
ফুরাত না তার ভক্তিরাশি !
প্রহর বহিয়া যায়—ধ্যান তার না ফুরায়,
কতক্ষণে উঠিত নিঃশ্বাসি' !

এখন সকলি বিশৃঙ্খল ;
হয় কি না হয় সেবা, তত্ত্ব তার লয় কে বা।
তুমি তাহে নহে ত চঞ্চল।
অনুরাগে—কি বিরাগে তোমার না চিত্ত জাগে ;
'দেব' 'দৈত্য' কথা কি কেবল।

দিনু পদে কত অর্ঘ্য-ভার,
সারা নিশি পড়ি' দ্বারে ডাকিলাম হাহাকারে,
বুঝিলে না যন্ত্রণা আমার।
শত্রু হ'লে —আমি প্রাণী—লই তবু বুকে টানি',
নাহি হানি বজ্র বুকে তার।

দেব-দয়া নাহি চাহি আর !
ইচ্ছা হয়,—দৈত্য সম লয়ে নিজ তমঃ ভ্রম
মৃত্যুরে আক্রমি একবার—
গ্রহ-উপগ্রহ টানি' প্রিয়ারে ফিরায়ে আনি !
দেখি, মৃত্যু কি করে আমার !

ত্যজ' গৃহ, যাও নিজ স্থান।
আর আমি পূজিব না, হৃদয়ে যে পারিব না
তোমা মত হইতে পাষাণ।
গেছে সুখ, গেছে প্রীতি ; আছে বুকভরা স্মৃতি,
যাবে দিন করি' তার ধ্যান।

৫

হে পূত তুলসী বিষ্ণুর প্রেয়সী,
বিবর্ণ তোমার দল ;
প্রভাতে আসিয়া প্রণাম করিয়া,
কে বা মূলে ঢালে জল !

সন্ধ্যায় আসিয়া, গলে বস্ত্র দিয়া
কে বা তলে দীপ জ্বালে !
নীরস মঞ্জরী পড়ে ঝরি' ঝরি,'
লূতা-তন্তু ডালে ডালে।

বলিত আমায়,—নমিতে তোমায়
দুগ্ধ পুষ্প তিল দিয়া ;
তোমার নিঃশ্বাসে সর্ব্ব রোগ নাশে,
যায় দুঃখ পলাইয়া।

আর—এ অন্তর ছিল কি সুন্দর !
প্রণয়-স্বপনে লীন—
সহজ, সরল, কবিত্ব-বিহ্বল,
সুখে দুখে উদাসীন।

ছিল এই ধরা কত মনোহরা।
নয়নে নয়ন পড়ে,—
আকাশে বাতাসে দেবতা নিঃশ্বাসে,
জলে স্থলে সুধা ঝরে।

হেরি' নরে—মম হ'ত ঋষি-ভ্রম,
নারী ছিল দেবী সমা ;
মন্দার-কলিকা বালক বালিকা,
বিধাতা সাক্ষাৎ ক্ষমা !

আজ প্রেম-হারা এরা সব কারা ?
স্বার্থ-ভরা নারী নর !
জগৎ—নরক, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ;
মৃত্যু এক সর্বেশ্বর !

বিধি বিধি-হীন, চলে' যায় দিন,—
আছি চেয়ে অন্য কেহ !
উঠি চমকিয়া, বুকে হাত দিয়া
বুঝি—এ আমার দেহ ।

হুহু করে প্রাণ, এ গৃহ শ্মশান ;
বৈকুণ্ঠ—শ্মশান-মাঝ !
চিতাভস্মে তার উড়িছে আমার
সুখ-স্বপ্ন-আশা আজ !

চল, হে তুলসী, ভস্মে তার বসি',
স্মরি' তারে, স্মরি'—স্মরি'—
আলোক মরুক্, আঁধার ঝরুক্,
আমরা নিঃশব্দে মরি ।

৬

দ্বিপ্রহর ; বর্ষানিশা ;
অন্ধকার দশ দিশা,
দুর্গ-দ্বারে একা সান্ত্রী মত,
জীবনে জাগিয়া অবিরত !

প্রতি পলে, প্রতি শ্বাসে
জীবন গুটায়ে আসে—
বুঝিতেছি অতি পরিষ্কার !
উঠি, বসি, চলি বার বার।

নিশা না পোহাতে চায়,
জীবন না ছুটী পায় !
দূরে—বাজে রাজার তোরণে
তৃতীয় প্রহর, কত ক্ষণে !

একবার চীৎকারি'—চীৎকারি',
দেখি ওই গগন বিদারি'
কোথা সে আমার!
পশু পক্ষী কীট অগণন,
সকলেরি রয়েছে জীবন;
শুধু—নাই তার!

গেল কি—গেল কি একেবারে?
মরিলেও পাব না তাহারে?
ফুরাল সকল!
প্রাণ তবে, নয়—কিছু নয়?
দেহে জন্মি' দেহে হয় লয়—
পুষ্পে পরিমল?

বীণে যথা স্বর-আলাপন,
সংযোজনে তাড়িত-স্ফুরণ,
তেমনি কি প্রাণ—
শুধু—শুধু—রসায়ন-ক্রিয়া ?
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে গিয়া
লভিছে নির্ব্বাণ ?

প্রীতি, স্মৃতি, ভাবনা, কল্পনা,
সকলি কি ক্ষণিক ছলনা—
অলীক স্বপন ?
অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার !
জড় ধরা—জড় দেহ সার ?
মৃত্যু কি ভীষণ !

যেতেছিল জীবন বহিয়া—
নিজ ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ নিয়া
সরল বিশ্বাসে ;
আচম্বিতে সিন্ধুশৈলে ঠেকি'—
মরণে প্রত্যক্ষ আজ দেখি !
জাগি সর্ব্বনাশে !

আশা শুষ্ক, বাসনা নিঃশেষ,
ভুলেছি সে মুক্তি, উপদেশ,
সে আত্ম-প্রত্যয় ;
শিক্ষা দীক্ষা—সব মিথ্যা ভ্রম,
অবিশ্বাস—সংশয় বিষম,
বিহ্বল হৃদয়।

মনে হয়,—বসিয়া গম্ভীরে,
জগতে প্রতি শিরে শিরে
চালাইতে ছুরী ;
ছিন্ন-ভিন্ন তন্ন-তন্ন করি',
প্রতি অণু-পরমাণু ধরি'
দেখি কি চাতুরী !

জীবনের এ শোক-বিস্বাদ—
স্বধু কি জীবের অপরাধ,
জীবের নিয়তি ?
এক দিন—কেহ একবার
করিবে না তোমার বিচার,
হে অন্ধ-শকতি !

নাই যদি—নাই লোকান্তর,
জীবনের অভিনব স্তর,
পবিত্র বিকাশ ;
প্রতি দিন কেন প্রাণী ভবে
স্ব-ইচ্ছায়, গরবে, গৌরবে
করে দেহ-নাশ ?

কেন বুদ্ধ ত্যজিল আবাস,
কেন নিল নিমাই সন্ন্যাস—
মৃত্যু যদি শেষ ?
কেন—তবে কিসের কারণ
জ্ঞানী যোগী ভক্ত অগণন
সহে তপঃক্লেশ ?

যেথা গেছে, কেন ভাবে প্রাণী,—
নাহি রহে ধরণীর গ্লানি,
তুচ্ছ দুঃখ শোক ?
নাহি রহে বিফল বাসনা,
পাপ, তাপ, অদৃষ্ট-ছলনা—
বিমুক্ত নির্ম্মোক ।

সূক্ষ্ম দেহ, মন নির্ব্বিকার,
কি আনন্দ স্থির চেতনার—
আনন্দে মগন !
শত্রু-মিত্র সনে দেখা হয়,
নাহি আর পূর্ব্ব-পরিচয়,
বিস্মৃত স্বপন ।

দেবলোকে দেবত্ব লভিয়া
সে কি গেছে দেবত্বে ডুবিয়া ?
সে নাই 'সে' আর ?
জ্যোতির মণ্ডলে বসি'—বসি'
সে কি আর উঠে না নিঃশ্বসি',
স্মরি' গৃহ তার ?

এগা

কি দেবতা—তীব্র ভয়ঙ্কর!
ভাবিতে যে শিহরে অন্তর,
হয় না ধারণা,—
প্রতি মুহূর্তের সে বন্ধন,
সকলি কি প্রলাপ-বচন—
বিকৃত কল্পনা?

জগৎ কি শুধু নাট্যালয়,
জীবন কি শুধু অভিনয়,
মিথ্যা—মিথ্যা সব?
ধীরে ধীরে যবনিকা পড়ে,
যে যাহার চলে' যায় ঘরে
বিভিন্ন মানব?

নাই তবে—আর তবে নাই,
যাহা ছিল, যাহা আমি চাই,
ঘরের ঘরণী,
সুখে দুঃখে জীবন-সঙ্গিনী,
শুদ্ধা, হৃদ্যা, শুভ-আকাঙ্ক্ষিণী,
পুত্রের জননী।

দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক
এতদিনে কি করিল ঠিক ?
সুধুই কথায়—
জগতের সুখ-শোভা নিয়া,
আর এক জগৎ গড়িয়া
ভুলায় বৃথায়।

অহো, সেই অনির্দ্দেশ-দেশ,
যেথা জীব করিলে প্রবেশ
আর নাহি ফিরে
আমরা ছলিতে আপনায়,
মৃতজনে পূত কল্পনায়
রাখি সদা ঘিরে'।

৯

কেন শোকে, মূঢ়ের মতন,
ত্যজিয়া বিশ্বাস সনাতন,
করি হাহাকার ?
ল'য়ে নিজ ভ্রান্ত মতামত
কেন—কেন আত্মহত্যা-পথ
করি পরিষ্কার ?

সত্য দেহ, সত্য এই প্রাণ,
সত্য এই সুখ-দুঃখ-জ্ঞান,
সত্য এ জগৎ ;
আদি নাই, অন্ত নাই যার—
ভু সত্য হয় মধ্য তার ?
অর্থ-হীন অস্তি ।

ছিনু, আছি, র'ব চিরকাল,
সে-ও আছে, চোখের আড়াল—
এইমাত্র ভেদ।
যত দিন ছিল কর্ম্মভোগ,
সয়েছিল দুঃখ শোক রোগ;
কেন তাহে খেদ ?

আমার রয়েছে কর্ম্মফল,
তাই আমি হতেছি বিহ্বল—
পাগলের প্রায়।
আমিও আমার কর্ম্ম-শেষে
পলাইব, তার মত হেসে—
জানি না কোথায়!

জীর্ণ দেহ করি' পরিহার,
নব দেহ ধরিয়া আবার
আসিব কি ভবে ?
মানুষে মানুষ পুনঃ হয়,
পশু পক্ষী—অন্য জীব নয় ?
কে আমারে ক'বে!

আবার কি হইবে মিলন ?
গত-জন্ম নাহি ত স্মরণ—
নূতন সকল !
এত আশা, এত ভালবাসা
পাবে না এ জীবনের ভাষা—
এ জন্ম বিফল ?

না না, না না, কর্ম্মে আছে ধারা,
কত গ্রহ রবি শশী তারা
রয়েছে আকাশে—
সে আমার নিশ্চয় কোথায়
বসিয়া আমার অপেক্ষায়,
গভীর বিশ্বাসে !

অণুতে অণুতে সম্মিলন,
আত্মায় আত্মায় আলিঙ্গন,
সুখ দুঃখ চূর্ণ !
শির 'পরে সময় না চলে,
বাধা বিঘ্ন নাহি পদতলে,
প্রেম পূত পূর্ণ ।

সে পেয়েছে তার কর্ম্মফলে,
আমি পাব কোন্ পুণ্যবলে
সেই পরকাল ?
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, লক্ষ্যে, আচরণে
কি বিভিন্ন ছিলাম দু' জনে-
আকাশ পাতাল।

কি বিশ্বাসে বাঁধি বুক আর--
কোথায় মিলন দু' জনার ?
বিফল কামনা।
পুরাতনে নূতনে মিলায়ে
ফেলিতেছি সকলি ঘুলায়ে —
কোথায় সান্ত্বনা।

দু' জনে ঢেউয়ের মত ফুটে',
গায়ে গায়ে, হেসে, কেঁদে, লুটে',
নিমেষের তরে-
কে বলিবে নয়—নয়—না,
কে কোথায় হতেছে বিলয়
কারণ সাগরে।

১০

নিশ্চয় আছেন এক জন।
যে অর্থ আমরা বুঝি, যে অর্থে তাহারে খুঁজি,
হয় ত তেমন তিনি নন।
কত দূরে সূর্য্যকায়া, জলে পড়িয়াছে ছায়া—
ছায়ামাত্র করি নিরীক্ষণ।

সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ-দল,
সবে চলে তালে তালে, নাহি বিকা বাধা জালে,
ধূমকেতু সময়ে উজ্জ্বল,
ঘুরে ধরা নিজ কক্ষে, বর্ষ ষড়-ঋতু রক্ষে—
মরণ কি সুধু বিশৃঙ্খল?

নদ, নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ,
উত্তাল সাগর-ভঙ্গ, চঞ্চল জলদ-রঙ্গ,
কত ছন্দে করে বিচরণ ;
করে ত প্রবল বন্যা ধরণীরে রসে ধন্যা—
কি করিছে অকাল-মরণ ?

প্রকৃতির নাহি ব্যভিচার।
বজ্রাঘাতে, ঝঞ্ঝাবাতে, স্খলিত তুষার-পাতে,
আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদ্গার,
ভূমিকম্প, জলস্তম্ভ, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-দম্ভ—
রাখিতেছে সমতা ধরার।

মরণ ত সৃষ্টির বাহিরে।
বীজে তরু, ফুলে ফল, ফলে পুনঃ বীজদল ;
ঝরে বৃষ্টি, উঠে বাষ্প ধীরে।
শিখর পড়িছে টুটে', ভূধর তেমনি উঠে—
জীবন কি আসে পুনঃ ফিরে ?

সতী মরি' জন্মিল পার্ব্বতী ;
সে ত পুরাণের কথা, মৃত্যুঞ্জয় নিজে যথা
স্কন্ধে ল'য়ে গতপ্রাণা সতী
ছুটিল পাগল-পারা, ত্রিভুবন শোকে সারা—
মরণ পলাল দ্রুতগতি।

নহি দেব—সামান্য মানব,
মৃত্যু-নামে সদা ভীত, মৃত্যু-ভয়ে নিয়ন্ত্রিত,
একমাত্র জীবন বিভব ;
ক্ষুদ্র জীবনের তরে কি না সহি অকাতরে—
মরণে করিতে পরাভব !

কভু ভাবি,—তাঁহারি জীবন
রয়েছে স্বজন, স্বজনে জীবন্ত করি',
বায়ু যথা ভরিয়া ভুবন।
অপ্রকাশ, স্বপ্রকাশি, ঘট-পট-শূন্যাকাশ—
আমাদেরি বিভ্রান্ত নয়ন।

দেখিতেছি পাষাণে চেতনা,
শুনিতেছি ধাতু-মাঝে জীবন-স্পন্দন বাজে,
জীবন-চঞ্চল অণুকণা।
স্থাবর, জঙ্গম, জীব, জল, স্থল, শূন্য, দিব,
ধূলি, বালু—তাহারি ব্যঞ্জনা।

কভু দেখি—মৃত্যু তুচ্ছ নয়।
ক্ষুদ্র শুক্তি, ক্ষুদ্র কীট, ধরিত্রীর পাদপীঠ;
শম্বূকে প্রবালে দ্বীপোদয়।
কি গূঢ়-উদ্দেশ্য তবে মরিতেছি স্তরে স্তরে—
দিয়া আত্মা, করি বিশ্বজয়?

সে আমার কোথা গেল চলি'?
ছিল সত্য, ছিল স্থূল, হ'ল সূক্ষ্ম, হ'ল ভুল,—
মনেরে বুঝাব এই বলি'?
ব্যষ্টিতে সমষ্টি-ভাব? ক্ষুদ্রে মহৎ লাভ?
আবার যে রহস্য সকলি।

১১

সদ্যঃস্নাত জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুণ্ডিত-মস্তক,
বসি' কুশাসনে ;
গলে উত্তরীয় বাস, 'পড়ে ঘন দীর্ঘশ্বাস,
পড়ে মন্ত্র গাঢ়-স্বরে, স্খলিত-বচনে।

কনিষ্ঠে লইয়া কোলে জ্যেষ্ঠা কন্যা বসি',
গলে বস্ত্র দিয়া ;
শুনে মন্ত্র এক-মনে, মুছে অশ্রু ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য-পানে দেখিছে চাহিয়া।

গায়ে গায়ে আছে বসি' ক্ষুদ্র কন্যা দুটী,
মলিন বদনে,
কভু ধীরে অশ্রু ঝরে, কভু চায় পরস্পরে,
কভু দু' জনার চক্ষু মুছায় দু'জনে।

চঞ্চল অবোধ শিশু হয়েছে চঞ্চল,
চারি দিকে চায়,
সবাই কাঁদিছে কেন? ভয়ে সে আড়ষ্ট যেন,
বারেক উঠিতে পেলে ছুটিয়া পলায়।

উজাড়ি' সমস্ত গৃহ আনিছেন মাতা,
কিসে স্বর্গ পায়!
কভু কাঁদি উচ্চরোলে করেন আমারে কোলে,
বলেন কাঁদিয়া কভু,—'তীর্থে রেখে আয়!'

'যে জীবা—অনল-দগ্ধা,—'পড়ে পুরোহিত,
কণ্ঠ শোকাকুল,—
তাহারি তৃপ্তির তরে দিতেছি যতন-ভরে
তৈজস, তণ্ডুল, শয্যা, বস্ত্র, ফল, ফুল।

কি অদেয় তারে আজ। তেমনি আসিয়া
সে কি চা'বে আর ?
সমস্ত জগৎ দিলে যদি তার দেখা মিলে।
সমস্ত জীবন যদি চাহে একবার।

পিতা নাই, মাতা নাই, পতি-পুত্র নাই,
অতি অসহায়—
সকল বন্ধন ছিঁড়ে' একাকিনী কোথা ফিরে—
অনলে, অনিলে, শূন্যে, কোথায়—কোথায়।

কোথায় ঝরিছে মধু, কোথা বিশ্বদেব,
কোথা প্রেতপুরী।
আমি আজ ধরাতলে, সভক্তি নয়ন-জলে,
মাগিতেছি মুক্তি তার, দুই কর জুড়ি'।

১২

দাও শান্তিজল !
দাও—দাও, ঘুচে' যাক্ যন্ত্রণা সকল।
সংসার—শ্মশান-ভূমি,
কোথা দেব, কোথা তুমি !
চিতাধূমে অন্ধ চক্ষুঃ, দগ্ধ মর্ম্মস্থল।
নিরাশার হা-হুতাশে
কত কি যে মনে আসে !
কোথায় তোমার স্নেহ—অমৃত-শীতল।

কবহ সংশয় দূর,
অশুভ অসত্য চূর,
দুর্ব্বল হৃদয়ে, দেব, দাও পূত বল !
দূর কর দুঃখ শোক,
জীবন সার্থক হোক্,
ধন-ধান্যে মধুময় কর ধরাতল !

কর বায়ু মধুগতি,
মধুময়ী স্রোতস্বতী,
মধুময় বনস্পতি, মধু ফুল ফল,
মধুময়ী নিশীথিনী,
মধুময়ী পয়স্বিনী,
মধুময় সূর্য্যালোক, মধু মেঘদল।

ঘুচে' যাক্ হাহাকার,
গর্ব্ব, দর্প, অহঙ্কার,
অবিচার, অত্যাচার, স্বার্থ-কোলাহল।
ঘুচে' যাক্ হিংসা দ্বেষ,
ব্যাধি জরা হোক্ শেষ—
দুরাশা, ভাবনা, ভয়, কপটতা, ছল।

ঘুচাও এ তমঃ-ভ্রম,
মুছাও নয়ন মম,
ভূলোকে দ্যুলোকচ্ছায়া হউক্ উজ্জ্বল।
যেন মনে প্রাণে মানি,—
চাহিতেছ কোলে টানি',
তোমারি সন্তান আমি, হে চির-মঙ্গল।

শোক

১

উঠিছে ডুবিছে তারাগণ,
জন্মিছে মরিছে শত মেঘ,
আসিছে খসিছে সমীরণ—
প্রাণহীন কিবা নিরুদ্বেগ।

তেজোহীন রবি দিন দিন
মসীঘন শশীর গহ্বর,
বার্দ্ধক্যে প্রকৃতি শোভাহীন,
ধরা—শুষ্ক পতিত প্রান্তর।

মৃত প্রিয়া। মৃত্যু সনাতন
মৃত্যুর নাস্তিক কারাজাল,
গেছে সুখ, নাহি তবু দুখ,
জীবন ত শুধু ইন্দ্রজাল।

শূন্য—এই শূন্য চিন্তা করি',
ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসি পাতায়,—
'শূন্য হয়ে আজ শূন্য হরি',
সত্য সুখ দুঃখ কেন তায় ?

'সেই প্রেম—সে কি গো কুহক ?
এখনো নয়নে মনে ভাসে !
এই স্মৃতি—জীবন-শোষক,
ছাড়ি, কি শূন্যতা হ'তে আসে ?'

হে প্রিয়, ভাবিয়াছিলে,—হয়েছি কাতর
প্রিয়ার মরণে ;
তার কথা—দুটী কথা, কথা অবান্তর
কহিনু দু' জনে।

হয় ত একটী শ্বাস,—নহে দীর্ঘ স্পষ্ট,
ছিলে তুমি শুনি' ;
বলেছিনু,—'বড় কষ্ট !—কি এমন কষ্ট ?'
কথা গুনি' গুনি'।

নহি শিশু, নহি নারী,—দুটি দিশি দিশি
করিয়া ক্রন্দন ;
নহি নির্ব্বিকার-চিত্ত, জ্ঞানী, ভিক্ষু, ঋষি—
বিমুক্ত-বন্ধন।

এ দুঃখ বরেণ্য ভূমা—জীবনের সাথী,
মরণ-সম্বল,
অসহ্য, অপরিহার্য্য,—বক্ষে দিবারাতি
জ্বলে যজ্ঞানল !

ইষ্ট-মন্ত্র কেহ যথা করে না প্রকাশ—
গুপ্ত অতিশয়,
নাহি রয় পবিত্রতা দৃঢ়তা বিশ্বাস,
সিদ্ধি নাহি হয় ;

ধরণী অন্তরে ধরে প্রচণ্ড অনল,
বক্ষে শষ্পভার ;
প্রকৃতির ধীর শ্বাস সুবাস-চঞ্চল,
প্রাণে হাহাকার ;

আকাশের ছায়া যথা সমুদ্র-হিয়ায়
রহে সদা পড়ি' ;—
তেমনি তাহার স্মৃতি বিবিধ মায়ায়
মনঃপ্রাণ ভরি' !

উড়ে পাখী, স্রোতে যথা ক্ষুদ্র ছায়া তার
নিমেষে মিলায় ;
অন্য সুখ দুঃখ আজ হৃদয়ে আমার
আশ্রয় না পায়।

এ নয়—কল্পনা, তর্ক, কবিত্ব-বিচার,
নিমেষের ভাণ,
হয়েছি উন্মত্ত কি না—দুঃখ-ধারণার
নহে পরিমাণ।

চক্ষে স্বপ্ন-কুহেলিকা, বক্ষে মরীচিকা,
মৃত্যুর তিমিরে—
নিঃশব্দে তাহার প্রীতি—দীপম্লান-শিখা
ঘুমাইছে ধীরে।

৬

দুস্তর প্রান্তর—নাহি যেন শেষ,
যত যাই—যত চাই ;
নাহি তরু লতা, নাহি তৃণ গুল্ম,
ধরার সম্পর্ক নাই।

ক্রোধ-তপ্ত বায়ু ছুটিছে আক্রোশে,
উড়িতেছে ধূলারাশি ;
তাম্র-তপ্ত রবি মধ্যাহ্ন-আকাশে
হাসিছে নিষ্ঠুর হাসি।

নিঃসঙ্গ একক শুষ্ক ভগ্ন তরু
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া ;
একমাত্র তার দীর্ঘ শীর্ণ বাহু—
শূন্যপানে বাড়াইয়া।

আসে না মধুপ, বসে না বিহগ,
　　আসে না পথিকজন ;
আকাশের তলে দাঁড়ায়ে একাকী,
　　গত-সুখ-নিদর্শন !

শরতে আর সে হয় না সরস,
　　বসন্তে ফুল না ধরে,
বরষায় তার ঝরে না নয়ন,
　　নিদাঘে নাহিক মরে।

আমি—আর আমি—জীবিত না মৃত !
　　জগৎ করিছে ধূ-ধূ ;
এক তার আশা—দীর্ঘ শীর্ণ আশা—
　　শূন্যে চেয়ে আছে সুধু !

জীবনে চাহি না কিছু আর।
সুধু তারে দেখি একবার,
                    একবার তার মুখখানি।
জ্বলুক্—যতই জ্বলে প্রাণ,
করিব না কোন অভিমান,
                    সুখী হব, 'সুখে আছে' জানি'।

জীবনে সে পায় নাই সুখ,
দুখে কভু ভাবে নাহি দুখ,
                    রোগে শোকে হয় নি চঞ্চল ;
সরল অন্তরে, হাসিমুখে,
সকলি সহিয়াছিল বুকে ;
                    কাঁদিলে যে হবে অমঙ্গল!

বলেছি অনেক শত কথা,
দিয়েছি অনেক বুকে ব্যথা,
সকলি সয়েছে ভালবাসি';
অনাদরে ফাটিয়াছে বুক,
তবু ফুটে নাই কভু মুখ,
হাসিতে ঢেকেছে অশ্রুরাশি।

পায় নাই যতন আদর,
তবু—তবু ছিল কি সুন্দর!
ইঙ্গিতের বিলম্ব না সয়—
প্রাণের মমতা যত্ন দিয়া
সব দুখ দিত মুছাইয়া,
দিত পদে পাতিয়া হৃদয়।

সুখে দুখে ছিল চির-সাথী
জগৎ-জুড়ান জ্যোৎস্না-রাতি!
জীবনের জীবন্ত স্বপন!
আপনারে হারায়ে—হারায়ে
গিয়াছিল আমাতে জড়ায়ে,
প্রতিদিন-অভ্যাস মতন!

৫ ॥

পড়ে' আছে পাশে পাশ —
অসঙ্কোচে করি আলিঙ্গন,
দেহে দেহ, নাহিক লালসা।
হৃদে হৃদি, প্রাণে প্রাণ হেন —
অতি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যেন।
এক আশা ভাবনা ভরসা।

ছায়া সম ফিরি' নিরন্তর
কখন দিত না অবসর
বুঝিতে সে প্রেমের মহিমা;
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি আজ,—
তার প্রতি-দিবসের কাজ,
চলা, বলা, চাহনি, ভঙ্গিমা।

আহারে বসিলে, বসি' কাছে,
"খাও, নাও, কেন পড়ে' আছে?"
কত তৃপ্তি, কত ব্যাকুলতা।
নিশায় চরণ সেবা করি',
নিদ্রায় আনিত বলে ধরি';
প্রভাতে চরণে অবনতা।

যখন যা ক'রেছি মনন
আগে-ভাগে করি' আয়োজন,
অপেক্ষায় রহিত বসিয়া,
ক্ষুদ্র দুখ, তুচ্ছ অনটন
যখনি হয়েছি অন্যমন,
অমনি চেয়েছে নিঃশ্বসিয়া।

রোগে জাগি দ্বিপ্রহর রাতে—
শিয়রে বসিয়া পাখা হাতে,
নাহি নিদ্রা, নিমেষ নয়নে;
স্বপ্নে যদি কভু কাঁদিয়াছি,
বলিয়াছে,—"এই কাছে আছি";
দেছে ঘর্ম্ম মুছায়ে যতনে।

ঘর দ্বার জগৎ সংসার,
সকলি—সকলি ছিল তার।
আমি নিত্য অতিথি নূতন;
দিলে পাই, নিলে তুষ্ট হই,
গৃহ-পানে কভু চেয়ে রই—
অনায়াস দিবস কেমন।

দিত মনে কি নব উল্লাস।
দিত প্রাণে কি দৃঢ় বিশ্বাস।
        শোকে দুখে কি স্নিগ্ধ সান্ত্বনা।
কত শক্তি আপদে বিপদে।
কত শোভা যৌবনে সম্পদে।
        ভুলে ভ্রমে নীরব মার্জ্জনা।

আজ বুঝি,—আমি অপরাধী,
মর্ম্মে মর্ম্মে তাই এত কাঁদি,
        সহি নিজ পাপ-তুষানল।
অহঙ্কারে রুদ্ধ করি' মন,
করেছিনু প্রেম-সংযমন—
        খুঁজেছিনু ছলনা কেবল।

বলি নি, বলিতে ছিল কত ?
লুকাইতে ছিলাম বিব্রত,
        লয়ে অভিমান রাশি রাশি ;
মন খুলে'—প্রাণ খুলে' তারে
বলি নাই কেন বারে বারে,—
        'ভালবাসি—বড় ভালবাসি।'

শূন্য-গৃহে বসে' আজ ভাবি,—
করেছি প্রেমের শুধু দাবী!
সে দেছে সর্ব্বস্ব হাসিমুখে।
শূন্য-প্রাণে চেয়েছে কাতরে,
প্রেম-বিন্দু দেই নি অধরে।
ম্লান-মুখ চাপি নাই বুকে।

ল'য়ে তুচ্ছ বাদ-বিসংবাদ
ফুরাইল জীবনের সাধ!
অপ্রকাশ রহিল সকলি।
জীবনে সহজ ছিল যাহা,
মরণে দুর্ল্লভ আজ তাহা!
কে ক্ষমিবে? সে গিয়াছে চলি'।

৫

নাহি সে উৎসাহ, আশা, কামনা, কল্পনা ;
আজ আমি মরণের ত্যক্ত আবর্জ্জনা।
শীতে যথা শুষ্ক সরঃ—পড়িয়া নীরবে,
কুয়াসা-দুর্গন্ধ-ভরা গলিত-পল্লবে।
উবে' গেছে সুখ শোভা সুরভি সুসার ;
রয়েছে শৈবাল পঙ্ক—যা নহে যাবার।

গিয়াছে রাখিয়া মোর কি দীন জীবন !
আসে না প্রভাতে আর নব-জাগরণ ;
পড়ে না মধ্যাহ্নে আর সে শ্রম-নিঃশ্বাস ;
হয় না সায়াহ্নে আর আপনে বিশ্বাস।
আসে যায় দিনরাত, সেই অবসাদ—
মানে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে নাহিক আস্বাদ।

ধরা জুড়ে' পড়ে' আছে সুধু সেই দিন,—
সে ফুল্ল উজ্জ্বল চক্ষু হতেছে মলিন !
চায়—চায়—তবু চায়, কি বলিতে চায়—
হৃদয়ের ভাষা তার অধরে মিলায় !
হাতে ধরি, বুকে পড়ি, মুখে রাখি কাণ;
শীতল নিস্পন্দ দেহ, মুদ্রিত নয়ান !

মরণ-কালিমা দেহে, তবু কি সুষমা !
রাহুর কবলে যেন পূর্ণিমা-চন্দ্রমা !
কি মহিমা—কি ভঙ্গিমা—নির্ভয় হৃদয়
এখনি জাগিবে যেন মৃত্যু করি জয় !
কোথা তুমি—কোথা আজ, মৃত্যু-বিজয়িনী—
সর্ব্বার্থ-সাধিকে গৌরী শিবে নারায়ণী !

দিয়া তব রূপ-গুণ না হয় মরণে—
বাঁচিলে না কেন আর দু' দিন জীবনে !
সুধুই বুঝায়ে গেলে,—কি ছিলে আমার !
জীবনের সর্ব্ব-সুখ, জগতের সার !
না লইলে প্রেম-পূজা—প্রেম-প্রতিদান,
না করিতে আবাহন, দেবী অন্তর্দ্ধান !

মনে হয়,—ছুটে' যাই পিছে পিছে তব,
হউক না যত দুখ, সব দুখ স'ব।
এক দিন—কোন দিন - যদি কোন কালে,
চোখে চোখে দেখা হয় মেঘ-অন্তরালে!
বলিব না কোন কথা, দুটী করে ধরি',
চেয়ে—চেয়ে মুখপানে র'ব বুকে মরি'!

৬

অজয়ে জিজ্ঞাসে দাসী,—"কোথা মা তোমার ?"

মুখপানে চেয়ে রয়,

মনে যেন হয়-হয় ;

"মা—মা—আমা (র) মা"—বলে বার বার।

যেন ক্রমে ক্রমে বোঝে,

আঁখি চারি দিকে খোঁজে,

ক্রমে ফুলে' উঠে ঠোঁট, আঁখি ছল-ছল্।

"গিয়েছে মামার বাড়ী ?"

সায় দেয় মাথা নাড়ি',

আঁচল ধরিয়া বলে,—"চ(ল্)—চ(ল্) —চ(ল্) !"

"কোথা যাবে ? অন্ধকার—"

মানা নাহি মানে আর,

কাঁদিয়া লুটায় ভুমে,—সান্ত্বনা বিফল।

৭

গেছে নিশা। দুঃস্বপ্ন অনিদ্রা ল'য়ে তার।
হৃদয়ে বাঁচিল যেন ফেলিয়া নিঃশ্বাস!
সেই পরিচিত গৃহ—সম্মুখে আমার,
ঘুমাইছে শিশুগুলি, মুখে স্বপ্ন-হাস।

ঝরে বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি, কভু বা ঝর্ঝরে;
ছিন্ন ভিন্ন লঘু মেঘ ভাসিছে আকাশে;
এখনো সুষুপ্ত গ্রাম—তরু-ছায়ান্তরে;
স্তব্ধ মাঠে শ্রান্ত-পদে শূন্য দিন আসে।

অদূরে মধর বট, দূরে ত্রস্ত শিবা,
খসিছে হরিদ্র পত্র সিক্ত মৃত্তিকায়;
এলায়ে পড়েছে লতা, সঙ্কুচিয়া গ্রীবা
ভিজিছে বায়স দুটী বসিয়া শাখায়।

জনহীন গ্রাম্যপথ কর্দ্দমে পিচ্ছল;
গলিত বনজ-গন্ধে বায়ু ওতপ্রোত;
অঙ্কুরিত ধান্যক্ষেত্রে 'কাণে কাণে' জল,
কোথা বা বুদ্বুদ উঠে, কোথা বহে স্রোত।

ক্ষীণা সরস্বতী আজ দুই কূল ভরি'
পড়ে' আছে গতিহীনা হরিৎ-বরণা;
ভাসিছে শৈবাল-দাম, ক্ষুদ্র তাল-তরী;
বংশ-সেতু 'পরে ক্রৌঞ্চী মুদ্রিত-নয়না।

তীর-বেণু-বনে উঠে ভেক-কলস্বর;
ডাকিছে চাতক দূরে আসার-পিপাসী;
সজল শ্যামল তৃণ, শ্যামল প্রান্তর;
বৃতিপাশে শেফালিকা, মূলে পুষ্পরাশি।

ক্বচিৎ তড়িৎ-মুখে ম্লান হাসি লুটে ;
ক্বচিৎ বলাকা যায় নভঃতলে ভাসি' ;
ক্বচিৎ প্রভাত-আলো মেঘ ভেদি' ফুটে ;
ক্বচিৎ সমীর ছুটে গভীর নিঃশ্বাসি' ।

সারা নিশা ঘুরিয়াছি কত গ্রহলোকে,
জন্মিয়াছি—মরিয়াছি কত শত বার !
কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—কত রোগে শোকে
খুঁজিয়াছি—মিলে নাই তবু দেখা তার !

৮

আবার দুঃস্বপ্ন সেই !—আবার পরাণ
জগতের দেহখানা জগতে ফেলিয়া,
ছুটিতেছে ঊর্দ্ধ-মুখে—উল্কার সমান,
রাশি রাশি বায়ুরাশি দু' হাতে ঠেলিয়া ।

স্পর্শনে—ঘর্ষণে বায়ু উঠে জ্বলি' জ্বলি' ;
দাপটে—ঝাপটে মেঘ দূরে সরে' যায় ;
ছুটে' আসে অন্ধকার উচ্ছ্বসি' উচ্ছলি' ;
বিজলী অশনি-শিলা পায়ে আছড়ায় ।

হতেছে নিঃশ্বাস-রোধ—নাহি বহে বায়,
ঘুরে' ঘুরে' সরে' গেছে পদ হ'তে ধরা !
সম্মুখে অসহ্য সূর্য্য—ক্রুদ্ধ-নেত্রে চায়,
তরল প্রলয়-অগ্নি ক্ষত বক্ষে ভরা ।

কত গ্রহ উপগ্রহ, বিচিত্র-দর্শন,
বিচ্ছুরি' বিবিধ-বর্ণ ঘুরে নিরন্তর।
কোথাও দহন শুধু, কোথাও বর্ষণ,
কোথা গিরি, কোথা মরু, কোথা বা সাগর!

কোথা আমি!—ল'য়ে ক্ষুদ্র গ্রহ-পরিবার
চক্রবালে ক্ষুদ্র রবি ধীরে অস্ত যায়।
এ কি সেই ছায়াপথ—সম্মুখে আমার!
পড়ে মোর দেহচ্ছায়া তারায় তারায়।

ঊর্দ্ধে—ক্রমে ঊর্দ্ধে—কোথা কিছু নাহি আর,
শুধু করি অনুভব ঈষৎ কম্পন।
শুধু শূন্য—চির শূন্য—অসীম—অপার!
আলোক-আঁধার-হীন স্তব্ধতা ভীষণ!

কোথা তুমি প্রাণাধিকা! -প্রতিধ্বনি ছুটে,
কি তুমুল কোলাহল, শূন্য শতখান!
কোথা ফুঁসে, কোথা জ্বলে, কোথা ধ্বসে, টুটে!
চমকি তরাসে—দেখি দিবা অবসান।

৯

আসে সন্ধ্যা, মুখে ল'য়ে দুরন্ত ঝটিকা,
রাশি রাশি শুষ্কপত্র ঘুরে' উড়ে' যায়।
ডুবিয়া গিয়াছে রবি,—দুটী রশ্মি-শিখা
লুটিছে দিগন্ত-কোলে মৃত্যু-যন্ত্রণায়!

থর-থর উঠে মেঘ,—পড়ে মেঘ মেঘে;
ছিন্ন ভিন্ন পিকদল নীড়-মুখে ধায়;
মড়্-মড়ে অরণ্যানী কাতরে উদ্বেগে;
ঊর্দ্ধ-পুচ্ছে গাভীকুল ছুটে গায় গায়;

ঝোপে-ঝাপে তরুতলে আঁধার ঘনায়;
ঝিকি-মিকি করে আলো নারিকেল-শিরে;
হাঁকিছে—ডাকিছে সবে আপন জনায়;
ফুলিয়া—ফুঁসিয়া নদী আছাড়িছে তীরে।

দাপটে—ঝাপটে বায়ু ছাড়িছে হুঙ্কার,
ভাঙ্গে শাখা, পাড়ে চাল, তরু উপড়ায় ;
দেখিতে—দেখিতে ধরা মেঘে অন্ধকার,
তড়্-তড়্ ঝরে বৃষ্টি মুষল-ধারায়।

উঠিতেছে চারি দিকে হাহাকার-ধ্বনি,
মেঘ হ'তে মেঘান্তরে ঝলসে বিজলী ;
কড়্-কড়্ মুহুর্মুহু গরজে অশনি ;
তরু-শির, গৃহ-চূড়া উঠে ধূ-ধূ জ্বলি'।

মনে হয়,—পাই যদি ওই বজ্র-বল,
ধরারে গুঁড়ায়ে ফেলি ধূলার সমান !
ঘুচে' যায় শোক দুঃখ ভাবনা সকল,
নাহি রহে বিশ্বে আর জন্মমৃত্যু-স্থান !

১০

প্রভাত প্রশান্ত স্থির ;
সম্মুখে বিহগ-নীড়,
বিহগী পড়িয়া তরুমূলে,
ঘোলা চোখ, কাদা-মাখা পাখা দুটা তুলে' ।

অন্ধক শাবকগুলি,
জিহ্বা মেলি', মুখ তুলি',
নড়ে-চড়ে, চীৎকারে কাতরে—
প্রভাত-বায়ুর স্পর্শে, তরুর মর্ম্মরে ।

হৃদয় কেমন করে,—
শিশুগুলি মনে পড়ে !
আশঙ্কায় ঘরে ছুটে' যাই,
চাপিয়া—চাপিয়া বুকে, মুখে চুমা খাই ।

মরেছে তাহার দেহ,
মরে নি ত প্রেম-স্নেহ—
রেখে' যেন গেছে সমুদয় !
সেই ক্ষুদ্র সুখ দুখ আশা তৃষা ভয় ।

তারি হৃদি হৃদে ধরি'
তারি গৃহকার্য্য করি ;
প্রতিকার্য্যে স্মরি অনুক্ষণ,
মরমে মরমে কাঁদি, মুছি দু' নয়ন ।

সদা কাছে কাছে রই,
কত হাসি, কত কই,
রাখি চোখে চোখে, কোলে কোলে ;
কি করিলে তার কথা, তার শোক ভোলে !

তেমনি পাতিয়া কোল
দিতেছি আদর-দোল—
কত সুরে করি গুন্‌-গুন্‌ ।
দিন দিন স্নেহে আমি কত সুনিপুণ !

ভালবাসি বুক পূরে',
তবু—তারা দূরে দূরে!
প্রাণ ভরে' তেমন না হাসে,
ঘুমায়ে—ঘুমায়ে তারে খোঁজে আশে-পাশে!

বকা-বকি ঘুষা-ঘুষি—
আমি যদি কভু রুষি,
এক জোটে সবে ওঠে কাঁদি'!
আমি শেষে অপরাধী—জনে জনে সাধি!

১১

সুপ্ত গ্রাম। দ্বিপ্রহরা অমা-নিশীথিনী,
দৃঢ় আলিঙ্গনে তার মূর্চ্ছিতা মেদিনী।
পথ ঘাট নদী মাঠ অরণ্য প্রান্তর
অভেদে মিশিয়া গেছে—কত দূরান্তর।
আলোকে ভূলোকে যেন ছিলাম হারায়ে,
আঁধারে আমারে পুনঃ পেতেছি কুড়ায়ে!
মৃদু-গতি হৃৎপিণ্ড, শিথিল শরীর;
হৃদয় বাসনা-হীন, উদাস, গম্ভীর।
জন্ম মৃত্যু, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কত মনে হয়,—
কি ভীষণ নর-ভাগ্য—চির-নিরাশ্রয়!
কাতর-অন্তরে ভয়ে ভাবি বারংবার,—
কোথা জীবনের শেষ—সমাপ্তি আমার!

বৃথা কূটবুদ্ধি, তর্ক, জ্ঞান-অভিমান !
কারণ সাগরে সুপ্ত পুরুষ-প্রধান ;
জন্মিল সয়ম্ভু-হৃদে সৃষ্টির কল্পনা,
কেমনে—কখন—কেন, হয় না ধারণা।
কল্পনার পরিণতি—জন্মিল শকতি,
নাহি জানি,—অন্ধ কিংবা সংবেদ-সংহতি।
সেই শকতির ক্রিয়া—এই ভূমণ্ডল,
দ্রষ্টা দৃশ্য উভ আমি—কর্ম্ম কর্ম্মফল।
অবরোহে জীব আমি, অধিরোহ-ক্রমে
লভিব ব্রহ্মত্ব শেষে—কত পরিশ্রমে !
নতুবা নিস্তার নাই,—জন্মি' বারংবার
হইবে সহিতে মোরে নিজ অত্যাচার !

অদূরে ডাকিল শিবা, চমকিল হিয়া,
পুনঃ ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ উঠিল জাগিয়া।
বক্ষে বিশ্বশোষী তৃষা—আজন্ম যন্ত্রণা,
কেন গণ্ডুষের লাগি' কাতর প্রার্থনা ?
যে চক্ষে ডুবিছে বিশ্ব প্রলয়-তিমিরে,
কেন তারে রুদ্ধ করি ঘেরিয়া প্রাচীরে ?

হে সত্তা—হে পরমাত্মা। এস একবার,
তোমায় আমায় হোক্ সম্বন্ধ-বিচার।
ঘুচে' যাক্ দেশ-কাল-পাত্রাপাত্র-ভেদ,
মিলনের সুখ-শান্তি, বিরহের খেদ।
যাক্—ঘটিকার শব্দ চিরতরে থামি'!—
সৃষ্টি নাই—স্রষ্টা নাই, নাই তুমি—আমি!

১২

অপগত মেঘ-আবরণ ;
নির্ম্মল আকাশ আজি , উজ্জ্বল তারকা-রাজি—
নির্নিমেষ হসিত-নয়ন ।
শুভ্র সূক্ষ্ম মেঘগুলি হেথা-হোথা উঠে তুলি'—
অমরার চঞ্চল গুণ্ঠন ।
দেবতারা মূর্ত্তি ধরি' নামিছে আকাশ ভরি' !
সৌরভে আকুল সমীরণ ।
আমি এই ক্ষেত্র-তীরে, যুক্ত-করে, নেত্র-নীরে,
করি, দেবী, তোমারে বন্দন ।

কর, মা গো, এ শোক মোচন !
মুছিয়া নয়ন-জলে হাসে ধরা ফুলে ফলে,
কাঁপে বুকে শ্যামল বসন ।
পূজিতে ও রাঙ্গাপদ নিল-ভরা কোকনদ,
জবা-ভরা মালঞ্চ, অঙ্গন ।

ঘরে ঘরে পুরাঙ্গনা দেছে দ্বারে আলিপনা
পূর্ণ-কুম্ভ, পল্লব-গ্রন্থন।
পূজা-গৃহে, গ্রাম-মাঝে, বলির বাজনা বাজে,
মা মা ধ্বনি—শুভ সন্ধিক্ষণ!

মুহূর্ত্তেক—স্তম্ভিত ভুবন,
বসি' যেন যোগাসনে, অর্দ্ধ-নিদ্রা-জাগরণে,
হেরিছে তোমার পদার্পণ!
অর্দ্ধ-শশী অষ্টমীর, চিত্রে যেন আছে স্থির—
দিক্-প্রান্তে ছড়ায়ে কিরণ!
কি সম্ভ্রমে—কি আতঙ্কে—নত-জানু ভূমি-অঙ্কে,
সঘনে শিহরে প্রাণ-মন!
সে যেন গম্ভীর শ্বাসে, ছায়া সম বসি' পাশে,
ম্লান-মুখ উপবাসে,
গল-বস্ত্রে—আমা সনে যাচে শ্রীচরণ!

১৬

শোকাচ্ছন্ন, পুরী-প্রান্তে শান্তির আশায়
ধাবে পাদচারে একা ভ্রমি সিন্ধুতীরে!
বিষণ্ণ সায়াহ্ন—দূর-দিগন্তে মিশায়,
ধরণী মলিন-মুখী তরল তিমিরে।

সমীর অধীর কভু, কভু ধীর-শ্বাস;
সরোষে আক্রোশে ঊর্ম্মি আক্রমিছে বেলা।
বিগত—বিশ্বাস ভ্রম সুখ দুঃখ ত্রাস;
জীবনে মরণে আজ সম অবহেলা!

জমিছে পশ্চিমে তমঃ কুণ্ডলি'—কুণ্ডলি',
কাঁপিতেছে পূর্ব্বাকাশ—অপূর্ব্ব সুষমা!
বাজিছে মঙ্গল-শঙ্খ; উচ্ছলি' উজ্জ্বলি'
উদ্ভাসি' বিচিত্র মেঘ, উদিছে চন্দ্রমা।

কল্-কল্, ছল্-ছল্, মত্ত অট্টহাস,
উদ্বেল উদ্দাম-সিন্ধু পড়ে আছাড়িয়া।
কত আশা—কত ভাষা—কত অভিলাষ
আলোড়িয়া মর্ম্মস্থল উঠে শিহরিয়া!

কি নীলিমা—কি অসীমা—ভঙ্গিমা হৃদয়ে!
মহিমায়—গরিমায় ভীষণ মহান্!
বিমূঢ়—আনন্দে ভয়ে, সৌন্দর্য্যে বিস্ময়ে—
কি তুচ্ছ মানব-দুঃখ গর্ব্ব অভিমান।

তরঙ্গে তরঙ্গে ছন্দ—শব্দ-আবর্ত্তন,
নাহি মাত্রা, নাহি যতি, অতৃপ্তি-বিহ্বল!
অনন্ত দুরন্ত বক্ষে অব্যক্ত ক্রন্দন—
ছন্দোহীন শব্দহীন স্পন্দন কেবল!

দূর গিরি—মেঘ সম মেঘে গেছে মিশি';
বায়ুর হিল্লোল মিশে সাগর-কল্লোলে।
চন্দ্রালোকে সুপ্ত ধরা, স্তব্ধ দশ দিশি;
একা সিন্ধু—ক্ষুব্ধ দৈত্য, গর্জ্জে দৃপ্ত রোলে।

আকুলিয়া ক্ষণে ক্ষণে—সর্ব্ব মনঃপ্রাণ
আসিছে নয়ন-অগ্রে, ভাষা না কুলায় !
ওই সাগরের যেন আজীবন-গান
আছাড়িয়া পড়ি' কূলে নিমেষে মিলায় !

দীপিছে কম্পিত আলো দূর স্তম্ভচূড়ে ;
উড়িছে তির্য্যক্-গতি সাগর-কপোত,—
এই জলে, এই স্থলে, এই কাছে—দূরে,
যেন শুভ্র চন্দ্র-কণা স্রোতে ওতপ্রোত।

পুলকে বালকে প্রান্ত, শ্লথ নিদ্রালসে,
শুভ্র, নবনীল অভ্র স্তরে স্তরে পড়ি'।
ক্বচিৎ তড়িৎ-শ্রী। ঈষৎ উল্লাসে ;
কালো মেঘে আলো দিয়া শশী যায় সরি' !

নীল—সুগভীর নীল—ফেনিল সাগর
তীরে রাখি' ফেন-রেখা সরে ধীরে ধীরে।
ভাবিতেছি,—ইতি নেতি, জন্ম জন্মান্তর—
ধূসর দিগন্ত ধীরে মিলায় তিমিরে।

আমি কি তোমারি ক্রিয়া, হে অন্ধ প্রকৃতি !
মুহূর্ত্ত-বিকার-মাত্র—ওই ঊর্ম্মি-প্রায়—
ল'য়ে ক্ষণ-সুখ-দুঃখ-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভীতি,
ফুটিয়াছি বিশ্ব-মাঝে অতি অসহায় !

বৃথা এই জন্ম-মৃত্যু, বৃথা এ জীবন !
অদৃষ্টের ক্রীড়নক, সৃজনের ত্রুটী !
বিধাতার কোন ইচ্ছা করি সম্পূরণ
বাসনায় উচ্ছ্বসিয়া, নিরাশায় টুটি' !

আলোকে আঁধারে দ্বন্দ্ব পূরব-সীমায়
নবীন জীবনে যেন জাগিছে জগতী !
জাগিছে ধূসর সিন্ধু নব-নীলিমায়—
সুদূর মন্দিরে বাজে মঙ্গল-আরতি।

হে ধর্ম্ম ! হে দারুব্রহ্ম ! কেন কর্ম্মভূমে
জীবের অবোধগম্য মৃত্যু-পরিণাম ?
লোক হ'তে লোকান্তরে কামনার ধূমে
ছুটিছে কি লুব্ধ আত্মা—লুব্ধ অবিশ্রাম ?

এ নিত্য অদৃষ্ট-যুদ্ধে—নিত্য পরাজয়ে
গড়িতেছি স্বর্গরাজী—ভবিষ্য কল্পনা ;
সে কি, নাথ, দেবশূন্য ভগ্ন দেবালয়ে
মুমূর্ষু প্রদীপ-শিখা—বিফল বেদনা ?

দিন দিন এই সিন্ধু করে প্রাণপণ,
তবু ত বিস্তীর্ণ তীর দেয় ক্রমে ছাড়ি' ।
অস্থির বাসনা হ'তে, হে বিশ্বশরণ,
তেমনি কি দৃঢ় কূলে লহ মোরে কাড়ি' ?

যায়, দিন যায়।
সে সুঠাম অভিরাম যৌবন কোথায়।
ক্রমে দৃষ্টি বিমলিন,
কেশ শুভ্র দিন দিন,
শোণিত উত্তাপ-হীন, বক্র ঋজু-কায়।
হে বসন্ত, বর্ষে বর্ষে
ধরারে সাজাও হর্ষে,
দিয়া নব পত্র পুষ্প, মৃদু মন্দ বায়।
সেই প্রেমে, সেই স্নেহে,
এস, এই জীর্ণ দেহে,
সে বিচিত্র বর্ণে গন্ধে ছন্দে সুষমায়।
যায়, দিন যায়।

যায়, দিন যায়।
সে নির্ম্মল সুকোমল হৃদয় কোথায়।
খুঁজে খুঁজে নিজ হিত—
দিন দিন সঙ্কুচিত,
দিন দিন কলঙ্কিত স্বার্থ-তাড়নায়।

হে কবিত্ব, এস ঘুরে'
এ বার্দ্ধক্য ভেঙ্গে-চুরে'—
শত গানে, শত সুরে, শত কল্পনায়।
ঘুচে' যাক্ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব,
ঘুচে' যাক্ ভাল-মন্দ,
ঘুচে' যাক্ জন্ম-মৃত্যু—প্রেম-মহিমায়!
যায়, দিন যায়।

যায়, দিন যায়।
সে ফুল ফোটে না আর—যে ফুল শুকায়।
কালস্রোত নাহি ফিরে,
পলি-রেখা পড়ে তীরে;
শুষ্ক পত্র ধীরে ধীরে মিশে মৃত্তিকায়!
কেন বসন্তের পরে,
ডাকে পিক ভগ্ন-স্বরে,—
নাহি মিলে গানে সুরে তানে মূর্চ্ছনায়!
ভালবেসে ছিল এসে,
দেখি নাই ভালবেসে'—
আজি জীবনের শেষে ভাবিতেছি তায়।
যায়, দিন যায়।

ওই বহ্নি—ওই ধূম—ওই অন্ধকার—
বিগত জীবন-স্বপ্ন, কিছু নাই আর!

জীবন-প্রথম হ'তে ওই পথে ধাই—
কাহারো চরণ-চিহ্ন কূলে পড়ে নাই।

কি ঘন-জলদে ঢাকা মৃত্যু-পরপার—
বায়ু না আনিতে পারে দূর-সমাচার!

তপন-কিরণে যায় সর্ব্ব বিশ্ব দেখা,
কোথা চির-মিলনের উপকূল-রেখা!

দুর্ভেদ্য দুস্তর শূন্য, ক্ষুদ্র-দৃষ্টি নর;
ওই বহ্নি—ওই ধূম! কিবা তার পর?

১৬

শিশু আজ সন্ধ্যাবেলা দিবে না পড়িতে ;
চা'বে এই বই-খানা,
কিছুতে না মানে মানা,
কোনমতে পাতাগুলা হইবে ছিঁড়িতে।
ছেঁড়া বই, ছেঁড়া পাঁজি—
কিছুতে সে নহে রাজি ;
হাঁড়ি, সরা, ছাতা, ঘোড়া —চাই না তাহার ;
ছবি, তাস, বাঁশী, ঢোল—
তবু সেই গণ্ডগোল,
অবশেষে ঘা-কতক দিলাম প্রহার।

কাঁদিতে কাঁদিতে দুষ্ট ঘুমা'ল এখন।
এবার নিশ্চিন্ত বেশ,
বই-খানা করি শেষ,—
দিনে দিনে হইতেছে আদুরে কেমন !

প্রতিদিন মনে হয়,—
এত স্নেহ ভাল নয়,
অনিত্য মায়ায় মজি' ভুলি নিত্য কাজ।
"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—"
অক্ষর পড়িছে নেত্রে,
বুঝিতে পারি না অর্থ, থাক্ তবে আজ।

নিঃশব্দে চুমিয়া—দিনু মুছায়ে নয়ান।
ম্লান জ্যোৎস্না মুখে লোটে,
ঈষৎ বিভিন্ন ঠোঁটে
এখনো কাঁপিছে যেন ক্ষুব্ধ অভিমান!
ভিজা-ভিজা আঁখি-পাতা,
নেতিয়ে পড়েছে মাথা,
শ্বসিছে নিঃশ্বাসে কত অব্যক্ত বেদনা!
তুলিলাম বুকে করি',
নয়নে রয়েছে ভরি'
তার মৃত জননীর বিস্মৃত প্রার্থনা!

১৭

এখনো কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক,—
এসেছিল—বসেছিল—ডেকেছিল হেথা পিক !
এখনো কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার,—
ঢলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার ।

এখনো শ্বসিছে বায়ু, মনে যেন হয়-হয়,—
ছিল তরু-লতা-কুঞ্জ-তৃণ-গুল্ম ফুলময় !
এখনো ভাবিছে ধরা, নহে বহুদিন-কথা,—
আকাশে নীলিমা ছিল, ভূমিতলে শ্যামলতা !

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন্ জনা ?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা !
মুরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন ।

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে,
পূরে নাই সাধ তার, ফিরে' গেছে অনাদরে !
কাতর-নয়নে চেয়ে—কোথা গেল নাহি জানি,
মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি !

কি ভাবিছে আমারে সে, কোথা বসে' অভিমানে !
আগে কেন বুঝি নাই,—সে-ও ব্যথা দিতে জানে !
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ঘুম, কেন গো স্বপন আর—
শীতের কুয়াসা ভাবে শারদ পূর্ণিমা তার !

গোলাপের দলে দলে পড়িয়াছে হিম-রাশি,
আদরে দুলায় শাখা প্রভাত-পবন আসি' ;
ঝরিতেছে হিম-ভার,
সরিতেছে অন্ধকার,
পাণ্ডুর অধরে তার ফুটিছে রক্তিম হাসি।

ওগো, তুমি এস—এস, শ্বসিয়া সে প্রেম-শ্বাস !
কত দিন আছি বেঁচে'—ক্রমে হয় অবিশ্বাস !
এস, মৃত্যু-দ্বার ভাঙ্গি'
আকাশ উঠুক্ রাঙ্গি',
পড়ুক্ হৃদয়ে মোর তোমার হৃদয়াভাস !

আবার দাঁড়াও, দেবী, দৃষ্টি-মুগ্ধ করি' হিয়া,
নারীসম ভালবেসে সুখে দুখে আলিঙ্গিয়া।
কৈশোর-কল্পনা সম
জড়ায়ে জীবন মম,
আধ-স্বপ্ন-জাগরণে—জগতে আড়াল দিয়া !

তরল-আলোকে গেছে আকাশ ভরিয়া।
সাদা সাদা মেঘগুলি
ভেসে' যায় হেলি' দুলি';
সুবাস-শীতল বায়ু বহে শিহরিয়া।
কোথা সাড়া-শব্দ নাই,
সুধু শুনিবারে পাই,—
পুট্-পুট্ পাকা পাতা পড়িছে ঝরিয়া।

নিজ-মনে পড়ে আছে নিস্তব্ধ ধরণী ;
    গাছে পাতে ফলে ফুলে
    নিটোল শিশির দুলে,
তৃণ 'পরে দেছে পাতি' শুভ্র আচ্ছাদনী।
    শির 'পরে ক্ষুদ্রকায়
    পিক এক উড়ে যায়,
অতি স্পষ্ট শুনা যায় তার পক্ষধ্বনি।

এখনো পড়ে নি আলো শাখায় শাখায়।
    ফুলে ফুলে ঘুরে' ঘুরে'
    প্রজাপতি যায় উড়ে',
চমকে সুবর্ণ-আলো হরিদ্র পাখায়।
    আলো-ছায়া-কুয়াসায়
    দূর-গ্রাম নিদ্রা যায়,
মন্দিরের চূড়া-চক্রে রশ্মি চমকায়।

অদূরে বহিছে নদী—সরিছে জুয়ার ;
    নিঃশব্দে প্রবাহ সরে,
    সিক্ত-তটে রেখা পড়ে,
চর-বালুকায় নড়ে আলোক-আঁধার।

দূরে ছোট ডিঙ্গি বেয়ে
জেলে যায় সারি গেয়ে,
পশিতেছে কাণে শুধু তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তার।

তরু-শিরে নব-পত্রে কিরণ দোদুল।
দূর মাঠে দেখা দিছে
গো-পাল, রাখাল পিছে :
কুম্ভ-কক্ষে যায় বধূ, নয়ন চটুল।
ক্রমে সূর্য্য জ্বল্-জ্বল্—
পথে ঘাটে কোলাহল ;
চমকি' উঠিল মন—ভেঙ্গে গেল ভুল !

প্রকৃতি—জননী—জননী !
করিয়া তোমার স্তন-সুধা-পান
পরাণে জাগিছে নূতন পরাণ !
নূতন শোণিত, নূতন নয়ান,
নূতন মধুর ধরণী ।

কি গভীর সুখ তোমাতে !
উদার পরাণ—নাহি পর কেহ,
উথলি' উছলি' বহিছে কি স্নেহ !
বিলায়ে ছড়ায়ে আপনারে দেহ—
কত কুড়াইব দু' হাতে !

কি মধুর গন্ধ বাতাসে !
নিশা সর্-সর্, বন মর্-মর্,
কাঁপিয়া ঝাঁপিয়া বহিছে নির্ঝর,
গ্রামে—গ্রামে—গ্রামে ওঠে কুহুস্বর,
স্বপনের স্তর আকাশে !

দেহ মনঃ প্রাণ শিহরে !
তরল আঁধার চিরি'—চিরি'—চিরি'
উষার আলোক ফুটে ধীরি ধীরি !
স্থির মেঘচ্ছবি—হিমালয়-গিরি,
রজতের রেখা শিখরে।

নয়ন আর যে ফিরে না !
ভুলে গেছে মন—আপনার কথা,
আপনার দুখ, আপনার ব্যথা ;
প্রাণ পায় যেন প্রাণের বারতা,
বুকে যে স্বপন ধরে না !

জলে ওঠে আঁখি ভরিয়া।
দেহে মিলে দেহ—পড়ে না নিঃশ্বাস,
প্রাণে মিলে প্রাণ—মিটে না পিয়াস,
প্রেমে মিলে প্রেম, সুখে—দুখ-ত্রাস,
সে কি এল পুনঃ ফিরিয়া!

মিটে না—মিটে না পিপাসা!
ম্লান শশিকলা শ্বেত মেঘে পড়ি'—
তরুণ অরুণে কি রাঙ্গিমা মরি!
গিরি-শির হ'তে পড়ে ঝরি' ঝরি'
তরল অলস কুয়াসা!

দুলিছে দ্যুলোক আলোকে।
জ্বল্-জ্বল্ জ্বলে ধবল-শিখরী,
কত-না অমরা লুকান' ভিতরি!
কত-না অমর—কত-না অমরী
ধরা-পানে চায় পুলকে!

কি মধুর ধরা, আ মরি !
দূরে—দূরে গৃহ, চিত্রে যেন লিখা ;
চূড়ায় চূড়ায় ওঠে ধূম-শিখা ;
মুক্ত-ভূমে নাচে বালক বালিকা,
তৃণ-ভূমে চরে চমরী ।

গগনে কি মেঘ-কাহিনী !
বন-ছায়-ছায় উছলায় ঝরা,
তরু-লতা-গুল্ম ফলে ফুলে ভরা,
স্বর্ণ-শীর্ষ ক্ষেত্র
দেছ সবে ধরা
তায় ছাড়িব না, জননী !

২১

আবার এসেছি আমি তোমার নিকটে,
হে অসীম, হে অপার !
কি নীলিমা—কি বিস্তার—
কি সুন্দর—কি মহান্—উদ্বেগে দাপটে !
কি অস্থির সংক্রমণ ।
কি গভীর আলোড়ন ।
বিস্মিত—স্তম্ভিত আমি দাঁড়াইয়া তটে ।

নাহি দিবা-রাত্রি-জ্ঞান,
অস্তমিত বিবস্বান্,
তুমি মত্ত আপনার প্রলয়-নর্ত্তনে !
তরঙ্গ আছাড়ি' তীরে
কাতরে কাঁদিয়া ফিরে ;
ক্ষুব্ধ বায়ু হা-হা করে নিষ্ফল গর্জ্জনে ।

উচ্ছ্বসিয়া—উল্লঙ্ঘিয়া,
সহস্র তরঙ্গ নিয়া,
সহস্র বাসুকি-ফণা ঘর্ঘর-নির্ঘোষে—
বক্ষে, ফেন রাশি রাশি,
কি বিকট অট্টহাসি!
ধরারে ফেলিবে গ্রাসি' আহত সংরোষে!

এইখানে ধরা শেষ—
ধরার সংঘর্ষ-ক্লেশ,
জীবনে মরণে সন্ধি—লুপ্ত আত্ম-পর।
কম্পিত ভঙ্গুর তট,
মহাকাশ সন্নিকট,
সাগরে জলদ-বিম্ব—জলদে সাগর!

এই চির মোহা-রবে—
যেন আমি একা ভবে
হেরি মূল-প্রকৃতির হৃদয়-স্পন্দন!
পলকে পলকে হয়
কত—না উত্থান লয়—
কত অনির্দ্দেশ আশা, অস্ফুট স্বপন!

ওই দূর চক্রবালে—
রহস্যের অন্তরালে
আভাসে প্রকাশ পায়,—সে আদি-কিরণ!
কোথা—তুমি বিশ্বস্বামী!
কোথা ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি!
কত তুচ্ছ—সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ!

সান্ত্বনা

১

সে সময়ে দিও দেখা !

নয়নে যখন ঘনাবে মরণ,
ধরণী হইবে ধূসর-বরণ ;
নয়নের তলে অতীত জীবন
স্বপনের সম লেখা !
পড়ে শ্বেতজাল শিব-নেত্রে 'পর,
শিথিল শরীর, হিম পদ-কর,
আনাভি নিঃশ্বাসে, কঠোর ঘর্ঘর—
সে সময়ে দিও দেখা !

পলাই —পলাই ভাঙ্গি' দেহ-কারা,
আছাড়ে হৃদয় উন্মাদ পারা,
ডাকে পরিজন নাহি পায় সাড়া—
গভীর নিস্মৃতি যাগ।
ভয়ে ভীত প্রাণ কাঁদিয়া কাতরে
শিরা-উপশিরা আঁকড়িয়া ধরে ;
দীপ নিবে-নিবে, সময় না নড়ে,
সবে করে হরিনাম।

অতি নিরুপায়, কোথা ছিল পড়ি'—
আজীবন-স্মৃতি আসে হা-হা করি' !
প্রতি দিনে দিনে রহিয়াছে ভরি'
কি গাঢ় কলঙ্ক-দাগ !
নিজ পাপে তাপে অদৃষ্ট গড়িয়া
দেহ হ'তে আমি যাই বাহিরিয়া—
সে সময়ে কাছে দাঁড়াবে কি, প্রিয়া,
ল'য়ে চির-অনুরাগ ?

২

সতী,
মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি!
তুমি যাহে দেছ পদ—
সে যে ফুল্ল কোকনদ!
সে নহে শ্মশান-চুল্লী—ভীষণ-মুরতি।
মৃত্যু যদি নাহি হয়
প্রেম হ'তে মধুময়,
দিবেন কন্যারে মৃত্যু কেন বিশ্বপতি?

তুমি চোখে মুখে হেসে,
উড়ায়ে আঁচলে কেশে,
চলে' গেলে নিজ দেশে অতি হৃষ্ট-মতি!
মানিলে না কোন মানা,
আমি কেন ভাবি নানা?
চায় না দেখিতে বাপে কোন্ স্নেহবতী?

কোন্ দিকে, কোন্ পথে—
চড়িয়া পুষ্পক-রথে
কখন চলিয়া গেলে তুমি দ্রুত-গতি!
চিতাধূম অন্ধকারে,
বিষম শোকাশ্রু-ভারে,
তখন দেখি নি চেয়ে—ছিনু ছন্ন-মতি।

আজ—দেখি, মুছি' অশ্রুভারে,
তোমারে ধরিয়া দ্বারে
ল'য়ে যান্ আগুসারে দেবী অরুন্ধতী!
দেববালা বেছে বেছে,
চরণে বিছায়ে দেছে,
মল্লিকা যুথিকা বেলা শেফালি মালতী।

আঁচলে নয়ন মুছে'
মাতৃলোক কত পুছে—
কত না তারকা-দীপে করিছে আরতি!
অপ্সরী কিন্নরী কত
চামর ব্যজনে রত,
অমর অমরী কত করে স্তুতি-নতি!

কমলা করুণা-ভরে
স্বর্ণ-ঝাঁপি দেন করে,
আদরে নয়ন দুটী মুছান ভারতী!
সম্ভ্রমে পরান 'শচী
পারিজাত-মালা রচি',
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু পরান' পার্ব্বতী!

শুভ সমারোহ হেন,
তবু যেন—তবু যেন—
তোমার সপ্রেম-দৃষ্টি খুঁজিছে জগতী!
আমি—রোগে দুখে শোকে,
গোধূলির ক্ষীণালোকে,
কর-যোড়ে করিতেছি মরণে মিনতি।

৩

হে মরণ, ধন্য তুমি! না বুঝে' তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে;
জগতে—তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায়!
আজি মোর প্রিয়তমা
তব করে বিশ্বরমা—
ভাসিছে ইন্দিরা-সমা সৃষ্টি-নীলিমায়!
কিবা বর্ণ, কিবা গন্ধ,
কিবা স্বর, কিবা ছন্দ—
জগৎ হতেছে অন্ধ প্রতি ভঙ্গিমায়!

নাহি কায়া, নহে জায়া,
নাহি সে সম্পর্ক-ছায়া—
জাগে শুধু প্রেম-মায়া স্মৃতি সুষমায় !
অতীত ঘটনা তুচ্ছ—
আজি কি পবিত্র উচ্চ !
গত-স্বপ্ন কি বিচিত্র মৃত্যু—অসীমায় !
কত স্বস্তি অনুপম
ঘুচায় বিরহ-ভ্রম !
কত স্বর্গ-পরিক্রম প্রতি লহমায় !
ধরার ঐশ্বর্য্য-আশে
আর না হৃদয় শ্বাসে,
সহি দুঃখ অনায়াসে প্রেম-গরিমায় !

গৃহ চূড়ে নর যথা সোপান বাহিয়া
উঠে ধীরে ধীরে—
এ জগতে নিরন্তর বাহি' শোক-দুখ-স্তর
উঠে কি মানব-আত্মা তোমার মন্দিরে ?

পদে পদে পরাজয়—অতি অসহায়,
অদৃষ্ট নির্ম্মম ;
এই অশ্রু, এই শ্বাস করে কি জড়তা-নাশ ?
দেয় কি নবীন আশ, নবীন উদ্যম ?

এই যে পশুর সম সতত অস্থির
প্রকৃতি-তাড়নে ;
এ মোহ-কলঙ্ক-লিখা—তোমারি কি হোম-শিখা,
দাহিয়া নীচতা দৈন্য উঠিছে গগনে ?

এই দর্প, অহঙ্কার, কু-চক্র, কু-আশা—
এ কি আরাধনা ?
এই কাম, এই ক্রোধ, দিতেছে কি আত্মবোধ ?
লোভে ক্ষোভে হতেছে কি তোমার ধারণা ?

জগৎ-ভিতর দিয়া জগতের জীব
বুঝে কি তোমায় ?
এই পড়ে, এই উঠে, এই হাহাকারে ছুটে—
পাপে অনুতাপে লভে দেব-মহিমায় ?

প্রবীণ জনক যথা শিশু-ক্রীড়া হেরি'
হাসিয়া আকুল—
অমনি কি দেহ-শেষে আমিও উঠিব হেসে,
স্মরি' নর-জনমের সুখ-দুঃখ-ভুল ?

জগতের পাপ-তাপ জগতেই শেষ—
কহ, দয়াময় !
উঠিয়া পর্ব্বত-চূড়ে, হেরি' ধরাতল দূরে—
পথের ত দুখ-ক্লেশ—ভ্রম মনে হয় !

আর কেন বাঁধি তোরে—শিকল দিলাম খুলি'
কত বর্ষ অনভ্যাসে উড়িতে গিয়াছে ভুলি'।
ঝাপটি 'পড়িল ভূমে, ভয়ে কাঁপে পাখা দুটী,
পুত্র-কন্যা দেয় তাড়া—করে ঘরে ছুটাছুটী।

ল'য়ে গেনু গৃহ-শিরে অতি সন্তর্পণে ধরি',
সর্ব্বাঙ্গে বুলানু কর কত-না আদর করি';
ক্রমে সুস্থ, তুলি' গ্রীবা চাহিল আকাশ-পানে—
মুখরিত উপবন কূজনে গুঞ্জনে গানে।

স্ফুরিল কাকলী মুখে, সঙ্গী উড়িল টিয়া—
উড়িছে—হরিৎ-পক্ষে স্বর্ণ-রৌদ্র আলোড়িয়া।
কি আলোক—পরিপূর্ণ! কি বায়ু—প্রাণদ-করা।
প্রকৃতি মায়ের মত হাস্যমুখী মনোহরা!

ধায়—ছাড়ি' গ্রাম, নদী ; দূর মাঠে যায় দেখা,—
দিগন্তে অরণ্য-শীর্ষ—শ্যামল-বঙ্কিম-রেখা ।
ল'য়ে শত শূন্য নীড় ডাকে ধরা অবিরত—
নীল স্থির নভস্তলে ভাসে ক্ষুদ্র মরকত ।

চকিতে সরিল মেঘ—কোথা কিছু নাই আর !
চকিতে ভাতিল মেঘে অমরার সিংহদ্বার !
ঝটিতি মিশিল বায়ে মিলনের কলধ্বনি—
ত্রিদিব পেয়েছে ফিরে' যেন তার হারা-মণি !

এই মৃত্যু—এই মুক্তি ! হে দেব, হে বিশ্বস্বামী !
আমিও ত বদ্ধ-জীব, আমিও ত মুক্তিকামী !
আমিও কি ফেলি' দেহ—বিস্ময়ে আতঙ্ক-হীন—
অসীম সৌন্দর্য্যে তব হইব আনন্দে লীন ?

ধর মোর কর !
সুখে দুঃখে লোভে অহঙ্কারে
যদি, দেব, ভুলিয়া তোমারে
যাই দূরান্তর !
রোগে শোকে দারিদ্র্যে সন্দেহে,
ভুলি' যদি তব পুত্র-স্নেহে
হই স্বতন্তর !
ধর মোর কর !

ধর মোর কর !
দেহ মন অস্থির সতত,
গড়িতে—ভাঙ্গিতে চায় কত
বিশ্ব-চরাচর !
বারবার পড়ি, উঠি, ছুটি,
কত চাই, কত তুলি মুঠি—
অতৃপ্তি-কাতর !
ধর মোর কর !

ধর মোর কর !
অবসন্ন দেহ মন আজ,
অসমাপ্ত জীবনের কাজ !
মৃত্যু-শয্যা 'পর—
শূন্য দৃষ্টি, শীর্ণ বাহু তুলি'
কারে খুঁজি আকুলি' ব্যাকুলি' !
হে চির-নির্ভর,
ধর দুটী কর !

৭

কি স্বপন সুমধুর !

দূর—দূর—অতি দূর—

বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠে স্বর্ণ-অলিন্দায়

দিয়া ভর, একাকিনী

দাঁড়াইয়া বিষাদিনী !

হেরিছে কাতর-নেত্রে ধরিত্রী কোথায় !

নীলবাসে দেহ ঢাকা,

মেঘে ঢাকা শশী রাকা,

ঝলকে ঝলকে কিবা আভা উছলায় !

সবৃন্ত মন্দার দুটী

বাম করে আছে ফুটি';

সোনার আঁচল লুটি' পড়ে রাঙ্গা পায়।

এলোকেশ বায়ুভরে
মুখে চোখে এসে পড়ে,
নত-মাথা কল্পলতা পড়ে ঢুলে' গায়।
সন্ধ্যায় নলিনী মত
মুখখানি অবনত,
কাঁপে হিয়া দুরু-দুরু আশা-নিরাশায়।

নিম্নে হিল্লোলিত ব্যোম,
কত সূর্য্য, কত সোম,
কত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়ায়।
কোথা ধরা ? ধরা 'পর
কোথা তার ক্ষুদ্র ঘর ?
খুঁজিয়া না পায় আঁখি—জলে ভেসে যায়।

আঁচলে মুছিয়া আঁখি,
করেতে কপোল রাখি,
আবার আগ্রহে কত চায়—চায়—চায়!
ওই না কন্দুক প্রায়
সে ধরণী দেখা যায়!
ওই না পূর্ণিমা-চাঁদ রৌপ্য-রেণু প্রায়!

পড়ি' ওই সেতুবৎ
তারকিত ছায়াপথ,
অবিশ্রাম মুক্ত-আত্মা আসে যায় তায় ;
অতি পরিচিত স্বরে
কেহ ডাকে সমাদরে,
কেহ স্নেহে এসে পাশে নীরবে দাঁড়ায়।

ছল্-ছল্ দু' নয়ানে
সে চায় সবার পানে,
কি ব্যথা বাজিছে প্রাণে—কে বলিবে তায় !
পড়ে শ্বাস গাঢ়তর,
দুখে লাজে জড়-সড়,
কাঁপে ম্লান বিম্বাধর—কথা না জুয়ায়।

[নহে শরতের বৃষ্টি,
এ যে গো তাঁহার দৃষ্টি—
কাঁপিছে অশ্রুর পিছে আশার কিরণ !
কি দীর্ঘ আমার প্রাণ—
কবে হবে অবসান !
যায় দিন—যুগ সম, আসে না মরণ !]

সূর্য্য নয়, চন্দ্র নয়—
গোলোক আলোকময়
বিষ্ণুর প্রশান্ত স্নিগ্ধ নেত্র-নীলিমায়।
নহে মধু-ফুলবাস—
কমলার ধীর শ্বাস
বহিছে কি প্রেমানন্দে প্রেম-গরিমায়!

নীল মেঘ নিরুপম
ছেয়ে আছে স্বপ্ন সম,
চপলা চেতনা-সম কভু শিহরায়।
স্বর্ণগৃহ-চূড়ে-চূড়ে
নব ইন্দ্রধনু স্ফুরে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে মণি-প্রস্তরায়।

কল্পতরু সারি সারি,
আশিবাদে কাঁপে বারি,
হরিণী অলস-আঁখি শীতল ছায়ায়;
পারিজাতে সুধাগন্ধ,
আনন্দে ভ্রমর অন্ধ,
শাখায় শাখায় পিক মৃদু কুহরায়।

শূন্যে বাজে বীণা বেণু,
শষ্পভূমে কামধেনু,
ধূ-ধূ উড়ে স্বর্ণরেণু বিরজা-বেলায়।
দীর্ঘ নেত্র, দীর্ঘ ভুরু,
ক্ষীণ কটি, শ্রোণী গুরু,
দুলিছে তরুণী কত লতার দোলায়।

কত সুকুমার শিশু,
ফুল্ল পারিজাত-ইষু,
হেলে-দুলে হেসে-গেয়ে নাচিয়া বেড়ায় ;
কত যুবা, কত বৃদ্ধ,
কত ঋষি, কত সিদ্ধ
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া রজঃ আনন্দে গড়ায়।

[এ নহে প্রভাত-বায়,
এ যে বুক ভেঙ্গে যায়—
আকুল নিঃশ্বাস তার, ব্যাকুল অন্তর !
আমি চিরদিন জানি,—
সে যে বড় অভিমানী !
সহিতে পারে না কভু প্রেমে অনাদর !]

কি মহান্—কি গম্ভীর—
প্রলয়-জলধি স্থির—
বিরাজে সর্ব্বতোভদ্র রুদ্র মহিমায় !
কি বন্ধুর—কি সরল !
কি কঠোর—কি কোমল !
পৌরুষে বিস্ময় ভয়, মোহ সুষমায় !

উত্তুঙ্গ শিখর-চূড়ে
গরুড়-কেতন উড়ে ;
নবগ্রহ নবদ্বারে গোপুর-মাথায় ।
গায়ে ফুল লতা পাতা,
কত-না কাহিনী গাথা ;
প্রাচীরে উদ্ভিন্ন মূর্ত্তি—নানা দেবতায় !

মণ্ডপ সহস্র-দ্বারী,
রুদ্রকণ্ঠ স্তম্ভ সারি,
ঝলকে খিলান ছাদ নীল-মণিকায় ।
তলভূমি ঢাকা ফুলে,
ফুলের ঝালর ঝুলে,
ফুলের লহরী দুলে চারু বেদিকায় ।

যুগে যুগে নারী নব—
নত-জানু, যুক্ত-কর,
প্রেমে গদ-গদ স্বর, রাসলীলা গায়।
বাজে শঙ্খ ঘন ঘন,
ফুটে পদ্ম অগণন,
ঘুরে চক্র সুদর্শন তড়িৎ-প্রভায়।

গর্ভগৃহে পদ্মাসন,
বসি' লক্ষ্মী-নরায়ণ।
বাক্য-মনঃ-অগোচর —নমামি তোমায়!
সৃজন-পালন-লয়
শ্রীপদে জড়িত রয়—
দেহি দেহি পদাশ্রয় শোকান্ধ জনায়।

প্রস্তরা—কার্নিস্। সর্ব্বতোভদ্র—বিষ্ণুর মন্দির বিশেষ। গোপুর—তোরণ। রুদ্রকণ্ঠ—ষোলপল-বিশিষ্ট স্তম্ভ। বোধিকা—স্তম্ভের শীর্ষস্থ কারুকার্য্য।

৮

হা প্রিয়া—শ্মশান-দগ্ধা, হও পরকাশ।
ত্যজিয়াছ মর্ত্ত্যভূমি;
তবু আছ—আছ তুমি।
তুমি নাই—কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস।
এত রূপ গুণ ভক্তি,
এত প্রীতি অনুরক্তি—
সৃজনে যে পূর্ণতার নাহিক বিনাশ।

নয়—এ মরণ নয়, দু' দিন বিরহ।
আলোকে সু-বর্ণ ফুটে,
আঁধারে সুগন্ধ ছুটে;
মিলনে নিঃশঙ্ক প্রেম—মত্ত অনাগ্রহ।
বিরহে ব্যাকুল প্রাণ—
সেই জপ তপঃ ধ্যান,
সেই বিনা নাহি আন, সে-ই অহরহ।

প্রতি কর্ম্মে—প্রতি ধর্ম্মে—উঠেছিলে, সতী,
উচ্চ হ'তে উচ্চতরে।
নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে
নামিতেছিলাম আমি অতি দ্রুতগতি।
ক্রমে বাড়ে ব্যবধান,
তাই হ'লে অন্তর্দ্ধান—
তোমারে স্মরিয়া যাহে হই শুদ্ধমতি।

হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান।
তোমারে হেরি নি, প্রভু,
বিশ্বাস করি হে তবু,—
সর্ব্ব-জীবে সর্ব্ব-কালে দাও পদে স্থান।
তোমারি এ বিশ্ব-সৃষ্টি,
আলো-অন্ধকার-বৃষ্টি,
জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক তোমারি প্রদান।

ভাঙ্গিতে গড় নি প্রেম, ওহে প্রেমময়।
মরণে নহি ত ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়।

শোকে ধূধূ হৃদি-মরু,
আছে তার কল্পতরু !
নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয় !

তুমি নিত্য সত্য শুদ্ধ, তোমারি ধরণী,
তোমারি ত ক্ষুদ্রকণা
আমরা এ প্রতিজনা,
শোকে দুঃখে ভ্রমে কেন পরমাত্ম গণি !
ব্যাপি' সর্ব্ব-কাল-স্থান
তব প্রভা দীপ্যমান্,
ব্যোমে ব্যোমে কম্পমান তব কণ্ঠধ্বনি !

দুরন্ত বাসনাবর্ত্তে সতত ঘূর্ণন—
নিরন্তর আত্মপূজা,
তোমারে না যায় বুঝা—
সৌভাগ্যে বিস্মৃতি ব্যঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দূষণ।
মলিন চঞ্চল মনে
যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
বুঝিতে না দেয়—তুমি কত যে আপন !

অনাদি অনন্ত তুমি—অসীম অপার।
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'
কত ভাঙ্গি—কত গড়ি;
করি কত সত্য-মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার!
নিজ সুখ-দুঃখ দিয়া,
তোমারে গড়িয়া নিয়া,
বসি তব ভাল-মন্দ করিতে বিচার!

মজিয়া আপন জ্ঞানে আপনা বাখানি;
রোগে-শোকে ভাবি ডরে
জন্মি নাই মৃত্যু তরে—
যদিও এ জন্ম-মৃত্যু কেন নাহি জানি!
জানি,—মনঃ প্রাণ দেহ
নহে আপনার কেহ—
তোমারে তোমারি দানে দিতে অভিমানী!

দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়!

জীবন—মরণ-পানে
বহে যাক্ সুরে গানে,
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয় !

ক্ষম' এ ক্রন্দন-গীতি—শোক-অবসাদ !
সে ছিল তোমারি ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া !
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ !
এখনো সে যুক্ত-করে
মাগিছে আমার তরে—
তোমার করুণা-স্নেহ, শুভ-আশীর্ব্বাদ ।

সম্পূর্ণ

যুক্ত রাজা হৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই,

এম, এল, সি মহাশয়ের নামে প্রবর্ত্তিত

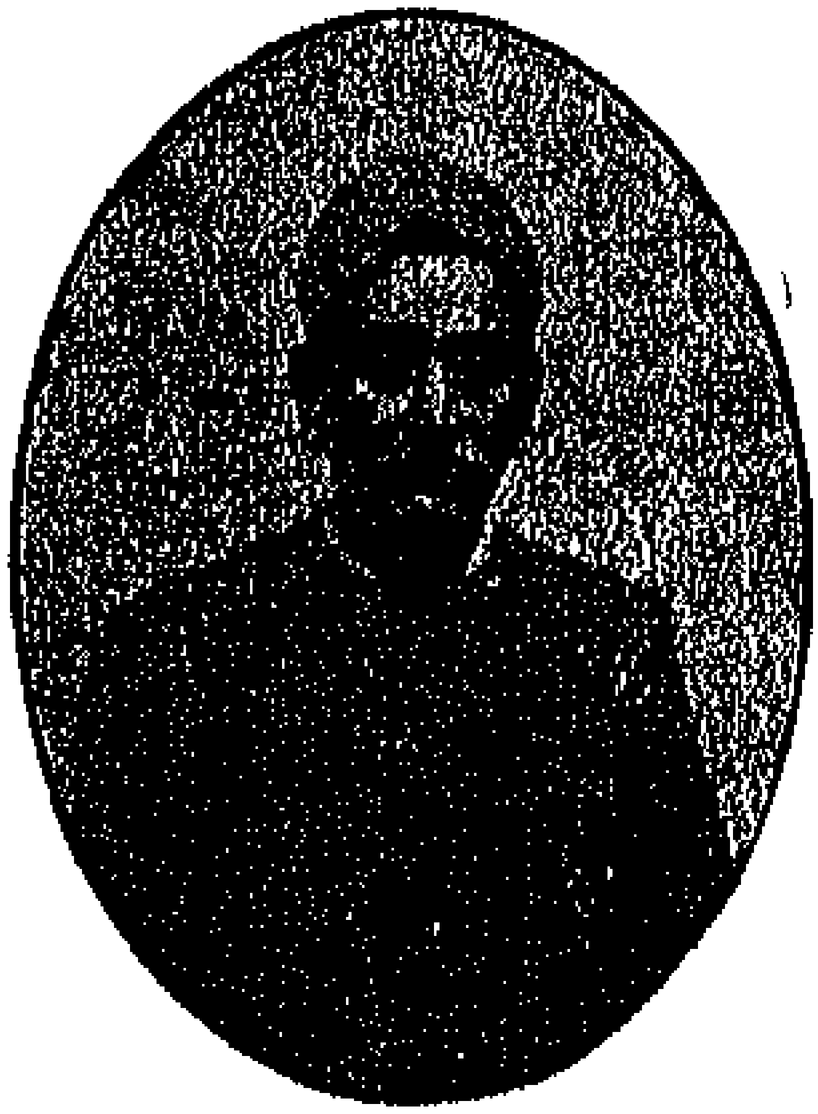

হৃষীকেশ-সিরিজ এর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলী

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর মূল্য—২৲

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত

proved by the Director of Public Instruction as a Prize and Library Book.

২। পাখীর কথা মূল্য—২।৹

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল ; এফ্-জেড্-এস্

প্রণীত

৩। ভারত-পরিচয় মূল্য—২৸৵০

৪। কান্তকবি রজনীকান্ত মূল্য—৪৲

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত

৫। চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ মূল্য—১৲

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, প্রণীত

পরে বাহির হইবে

১। বৌদ্ধধর্ম্ম

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত

২। স্থাপত্য-শিল্প

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

৩। বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত

দুর্গাচরণ সিরিজ

১। কথামৃত মূল্য—॥০

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় সঙ্কলিত

২। গৌড় পাণ্ডুয়া মূল্য—৷৹

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, এম, এ, বি এল প্রণীত

এষা (নবপ্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য—৷৹

কবিবর অক্ষয় কুমার বড়াল প্রণীত।

NATIONAL LIBRARY
Bound on
2.5.59
CALCUTTA